বন্ধুর স্মৃতি

প্রভাস ঘোষ

গ্রন্থ-ঘর
১৭ নং ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা।

প্রকাশক—পি, ঘোষ
গ্রন্থ-ঘর
১৭, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

প্রিন্টার—আর, সি, সুর
বী প্রেস।
৫০, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম দুই টাকা
১৩৫২

এই লেখকের উপন্যাস—

প্রীতি-উপহার
হীরার আংটী
রানীবৌ
বন্ধুর স্মৃতি
অসতী কেন হলুম
সোনালী কাজল

আগামী উপন্যাস—জাগেনি-যে-নীতি

উপহার

স্বর্গীয় 'দেশবন্ধু'র পুণ্যস্মৃতিতে

এই উপন্যাসখানি ১৩৩৮ সালের শরতে প্রথম বার হয়। তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অন্যরূপ। আর আজ আর এক; তবুও যে এখানির সংস্করণের পর সংস্করণ হচ্ছে সেজন্য পাঠকবর্গকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতি—গ্রন্থকার, ১।১।৫২

বন্ধুর স্মৃতি

শরতের উষা। দূরে পূজার বাড়ীর সানাইয়ের সুর আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘগুলি প্রভাতের সোণালী আলো মাখিয়া ধীরে ধীরে যেন কোন তীর্থে দেবতার দর্শনে চলিয়াছে; বিরাম নাই,—একটির পর একটি চলিয়াছে। শরতের আকাশ, শরতের বাতাস—হাসিতে আলোতে মাখামাখি হইয়া গিয়াছে।

বিশ্বনাথ নিজের বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। জানালার ধারে আসিয়া নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানি ভাল করিয়া পরিল। মেঝের বিছানায় তখনও তার ছোট বোন লতিকা ঘুমাইতেছে; ঠাকুর-মা পূর্ব্বেই শয্যা ছাড়িয়া গিয়াছেন। কাপড় পরিয়া বাসি চোখ-মুখেই বিশ্বনাথ একবার জানালার ধারে বসিল। তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে বটে, কিন্তু তখনও তাহার ঘুমের জড়তা সম্পূর্ণরূপে ছাড়ে নাই।

পাশের বাড়ীতে ভুবন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা পাঠ করিতেছিল। কাল পূজার ছুটি উপলক্ষে স্কুলে তাহাকে আবৃত্তি করিতে হইবে। সে আবৃত্তি করে ভালো, তাই সে-ই কবিতাটি মন-প্রাণ ঢালিয়া আপন মনে অভ্যাস করিতেছিল।—

বন্ধুর স্মৃতি

"মাতৃহারা মা যদি না পায়—
তবে আজ কিসের উৎসব !
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার-শাখা,
তবে মিছে মঙ্গল-কলস !"

ভুবন তন্ময় হইয়া পাঠ করিতেছিল। অপর বাড়ীর জানালায় বিশ্বনাথ তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। শেষের ক'লাইন আবৃত্তি করার পর ভুবন যখন থামিল, বিশ্বনাথের চক্ষু তখন জলে ভরিয়া গিয়াছে। কেন যে ভরিয়া গিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত সে বলিতে পারিবে না। তথাপি যেন-একটা অজানা কাহার গোপন স্নেহের পরশে সে এমনি করিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। একবার নিদ্রিত ছোট স্নেহের ভগিনীটির দিকে ফিরিয়া দেখিল ; তারপর নিজের কোঁচার খুঁটে সে চোখ দু'টী মুছিয়া কক্ষের বাহির হইয়া গেল। লতিকা নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইতে লাগিল। ভুবন-ভরা এত হাসি, দাদার নয়নের এত অশ্রু— কিছুই সে অনুভব করিতে পারিল না—চাহিলও না।

—বলি ওগো নবাবের বেটী, পড়ে পড়ে হেথা এখনো ঘুম হচ্ছে— তাই বলি, কে আর সাড়া দেবে।—এই কথাগুলি বলিতে বলিতে বাড়ীর সেজ-বৌ লতিকার চুলের মুঠি ধরিয়া একটি টানের জোরে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সজাগ করিয়া দিল। লতিকা চক্ষু রগ্‌ড়াইবার সময় পাইল না,—সেজ-বৌ সজোরে গালে একটি চড় মারিয়া পুনরায় বলিল,—বেলা আটটা পর্য্যন্ত ঘুম—ছেলেটা কোকিয়ে কোকিয়ে সারা হ'ল যে, সেদিকে একটু হুঁস্ নেই, যেন রাজরাণী ; দশটা চাকর

চাকরাণী আছে যেন ওঁর ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে—বলিতে বলিতে সেজ-বৌ আরো কয়েক ঘা দিল। লতিকা নিজের দোষ বুঝিবার আগেই কাঁদিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তখনি তাহাকে থামিতে হইল; কারণ সেজ-বৌ তাহার উপর আরেক ঘা দিয়া চুপ করিতে বলিল। তারপর C .লটাকে তার কোলে বসাইয়া দিয়া বলিল,—ভুলো একে, যেন আর ন দে, কাঁদলে তোকে আমি দেখাব। বলিয়া সেজ-বৌ নিজের লিয়া গেল।

লতিকা পাঁচ বছরের মেয়ে। মা তাহাকে দু'বৎসরের এবং বিশ্বনাথকে আট বৎসরের রাখিয়া এ বিশ্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তারপর হইতে তাহারা দুইজন পিতা, ঠাকুর-মা এবং চরণের স্নেহের কোলেই বাড়িয়া আসিতেছিল। পিতাও সেদিন স্বদেশীর হাঙ্গামায় পড়িয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতে চলিয়া গেলেন। জন্মভূমি মাকে ভালবাসার দণ্ড কেবল যে তিনি ভোগ করিলেন তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রাণ পিতার শাস্তি পুত্রে—কন্যায়—পরিবারের উপর অর্শিল। সুতরাং সোনারপুরের বন্ধুগুষ্টির সঙ্গে কেহ তেমন ভালভাবে মেলামেশা করিতেও পারিল না! কারণ কিজান, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা! গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে বিশ্বনাথ তেমন মিশিতে পারিত না। এ বিষয়ে অন্য বাড়ীর কর্ত্তাদের যেমন কড়া হুকুম ছিল, তেমনি কড়া নজরও ছিল। সেই জন্য গভর্ণমেণ্ট সাহায্য-প্রাপ্ত সেথাকার স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ও কমিটির সভ্য মহাশয়গণও তাহাকে স্কুলে লইবার অনুমতি দিলেন না। অতএব পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে সে তাহার পিতার নিকট হইতে যাহা উপদেশ এবং শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, তাহা লইয়াই সে গ্রামের ছোট জাতের ছেলেদের সঙ্গেই খেলা বা পড়াশুনা করিত।

বন্ধুর স্মৃতি

লতিকা পিতার দণ্ড অথবা মাতার স্বর্গারোহণ বিষয় তেমন কিছুই জানিত না। কেবল সে সেজ কাকীমা ও মেজ কাকীমার শাসনের ভিতর দিয়াই মানুষ হইয়া আসিতেছিল। এমনই তাহারা অবিচারের ভিতর নির্বিচারে বাড়িয়া চলিতেছিল।

ঠাকুর-মা স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলেন, লতিকা সেজ-বৌয়ের ছেলে কোলে করিয়া কাঁদিতেছে। তাহার সুন্দর গালে একটি আঘাতের দাগও রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে মার্‌লে রে লতি? আহা দেখি দেখি—ইস্, রক্ত জমে গেছে যে!

ঠাকুর-মার স্নেহে তাহার কান্না থামা দূরে থাক্, আরো ফুঁপাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। ঠাকুর-মা কাপড় ছাড়িয়া সস্নেহে বলিলেন—কি হয়েছে লতু, কে মেরেছে—সেজ কাকীমা বুঝি!

অনেকক্ষণ সাধাসাধির পর মেয়ে বলিল,—হুঁ।

—কেন মেরেছে দিদি? বলিয়া তিনি তাহার গণ্ডে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

—আমি ঘুমুচ্ছিলাম ঠাকু-মা, আমি কিছু জানি না।—

—না কিচ্ছু জান না—ছেলেটা কেঁদে কেঁদে দম আট্‌কে যাচ্ছিলো ভিট্‌কিলি মেরে প'ড়ে থাকা হয়েছিলো—আবার ঠাকু'মার কাছে আদর জানান হ'চ্ছে কিছু জানি না। নাকি-সুরে লতিকার স্বর অনুকরণ করিয়া সেজ-বৌ শেষের কথা কয়টি বলিয়া নিজের ছেলেকে লতিকার কোল হইতে তুলিয়া লইল।

শ্বাশুড়ী বলিলেন—তা বলে কি অমন ক'রে মারতে হয়? দেখ দিকিন্ গালটা কি হ'য়ে গেছে! ছেলে মানুষ ওকি—

—মা, তুমি দেখ ও ছেলে মানুষ—

—তা বলে কি অমন ক'রে—

—হাঁ, অমন ক'রে মারবো, এবার হ'লে পুতে ফেলবো, আস্তো রাখবো না—ব'লে সেজ-বৌ দুম্ দুম্ করিয়া চলিয়া গেল।

শ্বাশুড়ী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিতে লাগিলেন—সেও যে এর চাইতে ভালো, এমন দগ্ধে মারা কেন বাপু! ফেল না মেরে, তোমরা সবাইত মিলে মারচো, কোই মরেও না ত! বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বেলা দশটার পর বিশ্বনাথ এপাড়া ওপাড়া ঘুরিয়া আসিল। লতিকার গালে দাগ দেখিয়া কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল কে মারিয়াছে। চরণ, বড় বাবুর বিশ্বাসী চাকরটাও জানিল যে বাড়ীর সেজ-বৌ লতিকাকে ভীষণরূপে আদর করিয়াছে। ইহাতে তাহার বাবুর কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি কেমন দুই ভাই-বোনকে ভাল-বাসিতেন, তাঁহার কাছে ইহারা কত স্নেহের ছিল। তিনি এখন জেলে, এই ভাবিয়া তাহার চক্ষেও জল আসিল।

সেজ-বৌ মেজ-বৌ রান্নাঘরে বসিয়া স্বামীদের জন্য বৈকালের জল-খাবার তৈয়ারী করিতেছিল এবং আজিকার সকালের ঘটনার উল্লেখ করিয়া অনেক কথাই বলিতেছিল। সেজ-বৌ নেচি কাটিতে কাটিতে বলিল—নাতি-নাতনীর আদর দেখ্‌না সবেতেই আমার দোষ, ওঁর বিশু আর লতি খালি ভালো আর আমরা হলাম ভারি দুষ্টু; সেদনে হাদুর মাকে বলা হচ্ছিলো আমার যা দু'টি বৌ হয়েছে তা আর কি বলবো বোন! দুটিতে আমার বিশুকে আর লতিকে দুচক্ষে দেখতে পারে না, —খালি মার আর মার—একটু যদি ভালবাসে।

মেজবৌ বেলিতে বেলিতে বলিল—বড়বৌ ত আর হবে না, দেখ যদি নাতবৌ হয়ে আদর কর্‌তে পারে। আমাদের ত কাঠাম'য় আর শ্বাশুড়ীর সেবা হ'লো না।

সেজ-বৌ হাসিতে হাসিতে বলিল,—ততদিন উনি বাঁচ্‌লে ত।

এমন সময় বিশু রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিল। বলিল—মেজ-কাকীমা ভাত দেবে?

মেজ-বৌ বেলিতে বেলিতে বলিল—একটু দাঁড়াও।

সেজ-বৌ তাহার স্বভাবতঃ কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিল—সাত রাজ্যি ঘুরে এলেন, এসেই ভাত দাও; কে বসে আছে ভাত নিয়ে? যা এখন হবে না—যখন সময় হ'বে দেব। মুচিমদ্দভারাসের মত দিন দিন চেহারা হ'চ্ছে দেখ না!

লতিকার গালের দাগ ইহার কিছু পূর্ব্বে তাহাকে বেদনা দিয়াছে। এই কথায় পুনরায় তাহার অভিমান-বেদনা প্রাণে সজোরে হঠাৎ আঘাত করিয়া বসিল। বাপের মতই তাহার বড় বড় চোখ ছিল, তাহা নিমেষে ছল ছল করিয়া আসিল এবং বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু গণ্ডে গড়াইবার পূর্ব্বেই সে সে-স্থান ত্যাগ করিল। মেজ-বৌ ডাকিল—বিশু, আয় আয় দিচ্ছি।

সে কোন কথার উত্তর দিল না। নীরবে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

সেজ-বৌ মুখ বাঁকাইয়া বলিল,—ছেলের আবার ঝাল কত! থাক্ না ডাকবার দরকার কি? খিদে পেলেই আপনি আসবে খ'ন।

মেজ-বৌ শ্বাশুড়ীকে একটু ভয় একটু ভক্তি করিত; কিন্তু সেজ-বৌ ভ্রূক্ষেপও করিত না।

তথাপি মেজ-বৌ বলিল—খাবার সময় অমন বলতে নেই।

—না বলতে নেই—অমন ছেলেকে পূজো করতে হয়—বলিয়া আর কোন কথা না বলিয়া নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

বেলা তিনটা বাজিয়া গেল, তথাপি বিশুকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল

না। চরণ এঁটো কাঁটা সরাইবার সময় কাহারো পাতের কাছে কলার খোষা না দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মেজ-মা, বিশুর বুঝি আজ কলা আসে নি?

—না রে, সে কোথায় যে গেছে, আর খেতে আসেনি, তুই দেখ্ তো একবার তাকে বাবা!

চরণ ব্যথিত মুখে একবার তাহার দিকে দেখিল, জিজ্ঞাসা করিল—সেই সকাল থেকে একবারও আসে নি?

—না বাবা, তুই একবার দেখ্। চাকরের সামনে সত্য কথা বলিতে তাহার লজ্জা বোধ করিল। কারণ বিশুর উপর এই চাকরের যতটা স্নেহ ভালবাসা ছিল, তাহারা জানিত, তাহাদের কাহারো প্রাণে ততটা ছিল না। সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া এঘর-ওঘর খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু, বাড়ীর ভিতরে কোন ঘরেই তাহার দর্শন মিলিল না। বাহিরের ঘরে চরণ প্রবেশ করিয়া দেখিল, তক্তপোষের তলায় কে যেন শুইয়া আছে। তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না—যে সে-ই বিশু।

চরণ তাহাকে ছোট বেলা হইতেই মানুষ করিয়া আসিয়াছে। প্রাণপণ যত্নে তাহাকে এবং তাহার বোনকে স্নেহ ভালবাসা যতটা পারে, দিয়া আসিয়াছে। সে আজও তাহার বুড়ো বয়সে তাহাকে ছেলের মত ভালবাসে। একথা বাড়ীর কেন, পাড়ার গ্রামবাসীর কাহারও অবিদিত ছিল না। সে ডাকিল—বিশু এস, ওখানে শুয়ে কেন—তোমাকে ওদিকে মেজ-মা কত খুঁজছেন।—বলিয়া তাহার নিকট যাইতেই দেখিল, বিশু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, গণ্ডে তাহার বহুক্ষণ পূর্ব্বেকার অশ্রু শুকাইয়া রহিয়াছে। চরণ বিশুকে জাগাইল, বলিল—এস, উঠে এস লক্ষ্মীটি! মেজ-মা ডাক্‌ছেন, এখনও খাওনি, এখানে এসে লুকিয়ে আছ!

বিশু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,- না--না, আমি আজ খাব না কিছু।

—কেন ? কি হয়েছে ?

—না, আমার এমন কিছু হয় নি, আমি খাব না।

তারপর চরণ অনেক বুঝাইয়া, অনেক সাধিয়া তাহাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। তাহার মেঝ-মা বাড়া ভাত ধরিয়া দিল। চরণ তাহার কাছে বসাইয়া বিশুকে খাওয়াইতে লাগিল। ঘর হইতে সেজ-বৌ মেজ-বৌকে জিজ্ঞাসা করিল,—কি বাবুকে খুঁজে পাওয়া গেল, এলেন তিনি খেতে ?

বিশু একবার কাণ খাড়া করিল। চরণ ঐ কথা শুনিয়া বলিল—থাম না সেজ-মা, ঐ জন্মে ত তোমার সঙ্গে কারুর সঙ্গে—না—না—ঐ দুধ কলাটা খেয়ে ফেল, ফেলে উঠোনা বলচি।

বিশ্বমাতার পূজার আর মাত্র দুইটি দিন বাকি আছে। এখন হইতেই পূজার পোষাক-আষাক কেনা-বেচার ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। সেজ-বৌ এবং মেজ-বৌয়ের পুত্রকন্যাদের পূজার পোষাক কিনিয়া আনার আদেশ হইয়া গিয়াছে। আজই বোধ হয় সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিবে।

এ বাড়ীর পুত্রকন্যার সংখ্যা আশপাশের অন্য পরিবারের অপেক্ষা কম। বড়র ঐ বিশু আর লতি। মেজর কনক, বেণু, আশা। সেজর গোবিন্দ আর হীরা। ছোট এখানে থাকিত না, বিবাহও করে নি—বিদেশে সরকারী চাকরী করিত, বহুদিন হইল গত হইয়াছে।

সোনারপুরের কায়স্থপাড়ায় তাহাদের বাস। লেখা-পড়া শিখিয়া হীরেন একটি প্রেস খোলে। তারপর কিছুদিনের মধ্যে সেটাকে অপর

দুই ভায়ের নামে বেনামী করিয়া রাখে। মেজ সেজ ইহার কারণ জানিতে পারে নাই। এমন কি জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার নিকট হইতে কোন সঠিক উত্তর পাইত না। প্রেসের কাজ-কর্ম্ম সকলই ভাল ভাবে চলিতেছিল—হঠাৎ কেন যে সে বেনামী করিল, কেহই তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না। সকলেই ভাবিল, বুঝি অকালে স্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে এমনিই মতিগতি হইয়াছে। তবুও বাঁড়ুয্যে মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন,—নিজের ছেলেটার নামে লিখে দিলে না কেন—মন এখন খারাপ বটে, একদিন ত আবার সেরেও যেতে পারে।

হীরেন হাসিতে হাসিতে সেদিন বলিয়াছিল—ওর নামেও যা, ওর কাকার নামেও তা—নরেন সুরেন আমারই ভাই ত।

বাঁড়ুয্যেমশায় অপ্রস্তুত হইয়া সেদিন বলিয়াছিলেন—তা' ত বটেই, তা' ত বটেই—তবু কি না—

হীরেন একগাল হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল,—আপনি কি যে বলেন, আমার নিজের মায়ের পেটের ভাইকেই যদি না বিশ্বাস করতে পারবো ত কাকে আর বিশ্বাস করতে বলেন।

তারপর বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলন আসিল। হঠাৎ হীরেন কি-একটা ভয়ানক কেসে ধরা পড়িল। তাহার বহুবৎসরের জন্য কারাদণ্ড হইয়া গেল। এখন সেজ ভাই প্রেসের কাজ কর্ম্ম দেখে, আর মেজ ভাই একটা চটকলের আফিসের কেরাণী। সংসার তাহাদের আয়ের উপর এক রকম চলিয়া যায়।

হীরেনের কারাদণ্ড হইয়া যাইবার পর হইতেই প্রেসের আয়ও বাড়িয়া যায়। তাহার যত কিছু বই বাজারে হুহু করিয়া কাটতি হইতে থাকে; এবং তাহার স্বদেশ-প্রেমিকতার দরুণ কলিকাতার অনেকেই তাহার প্রেসে কাজ দিয়া থাকেন। সেও দণ্ড-ভোগে যাইবার সময়

অনেক টাকা তাহাদের হাতে গচ্ছিত রাখিয়া যায়। ভিতরের ব্যাপার কেহ বড়-একটা জানে না। বাহিরে প্রায় সকলেই জানে, মেজ ভাই এবং সেজ ভাইই বুঝি তাহাদের সকলের সংসার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু একমাত্র চরণ জানে,—বড় ভায়ের অফিস এবং তাহারই কার্য্যে সুরেন এত বড়। না হইলে তাহার এত বিদ্যা বা অধ্যবসায় ছিল না, যাহার বলে সে আজ এতো উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যাহার টাকা, তাহার পুত্র-কন্যারা একটি দিনের জন্যও সুখী হইতে পারে নাই। এমনই ছিল তাহাদের ভাগ্য।

সুরেন ব্যক্তিটি নিহাত মন্দ প্রকৃতির ছিল না; কিন্তু তাহার হিংসা-পরায়ণা মুখরা স্ত্রীর কাছে সে হার মানিয়াছিল। তাহার কাজে এবং কথায় সেজ পারিয়া উঠিত না, সেইজন্য সে সংসারের কোন কথাতেই থাকিত না। সমস্ত দিন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিত। মা, সেজ-বৌয়ের কথা কিছু বলিতে আসিলে সে বলিত—ওসব মেয়েলি কথার মধ্যে আমি নেই। মেজ নিজেরটি লইয়াই ব্যস্ত। অতএব তাহারা দুইজনে মার একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সংসারে শান্তি আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে ফল হইল এই যে—মা বড়র ছেলে মেয়ের ভার লইয়া পুরাতন চাকর চরণের তত্ত্বাবধানে কাল কাটাইতে লাগিলেন। বিশু আর লতি তাহাদের দুই কাকীমার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের হুকুমের চাকর চাকরাণীর মত খাটিয়া যাইতে লাগিল।

এসব সংবাদ নরেন সুরেন জানিয়াও জানিতে চাহে না; বাড়ীর অন্য কাহারও নিকট অজানা ছিল না। চরণ ছিল আগেকার চাকর, অতএব তাহার দুঃখ ছিল সব চেয়ে বেশী। কারণ, যে বড় বাবুর টাকায় মেজবাবু সেজবাবু এত নবাবী করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহারা তাঁহার ছোট দুইটি পুত্র-কন্যার জন্য আধ্ পয়সাও খরচ করিতে কুণ্ঠিত। যে বড়-মা

সকলের বিপদে আপদে প্রাণপণ করিয়া খাটিয়াছে, করিয়াছে, তাহার ছেলেরা আজ কি না পথের ভিখারীর মত খাওয়ার জন্য হা-পিত্তেশ করিয়া থালা হাতে করিয়া বসিয়া থাকে, কখন তাহাদের কাকীমার দয়া হইবে তবে তাহারা খাইতে পাইবে। এরকমের কথা যতই সে ভাবিত, তাহার মনপ্রাণ ততই ব্যথায় ভরিয়া উঠিত, চোক অশ্রুতে ভাসিয়া যাইত; কাহাকেও জানাইত না, কেবল বামুন পাড়ার কালীতলায় গিয়া মাঝে মাঝে বিশু এবং লতির জন্য মানত করিত।

এই সব সুখ দুঃখে ঠাকুর-মা এবং চরণের দিন কাটিয়া যাইতেছিল।

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, সুরেন একতাড়া কাগজ-মোড়া কি সব আনিল। সেজ-বৌ রান্নাঘর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়াই উপরে উঠিয়া আসিল এবং অল্পক্ষণ পরে মেজ জায়ের ঘরে গুটি কয়েক মোড়ক দিয়া চলিয়া যাইতেছিল; সে তাহাকে ডাকিয়া বলিল—দেখি গোবিন্দ হীরের জন্যে কি পোষাক হ'লো।

সেজ-বৌ হাসিমুখে তাহা দেখাইল। মেজ কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিল,—বিশু লতির জন্যে কিছু এলো নাকি?

সেজ তাচ্ছিল্য ভাবে বলিল, কই তাত কিছু দেখিনি, জিজ্ঞাসাও করিনি, আর আন্‌লে কি আর দেখতে পেতুম না।

মেজ-বৌ গম্ভীর মুখে বলিল—না, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম, ওরা সবাই নতুন কাপড় জামা পরে ঠাকুর দেখতে যাবে, আর ওদের দু'জনের না হ'লে লোকে বলবে কি?

সেজ মুখ ঈষৎ বাঁকাইয়া বলিল, লোকে ত বলবে জানি, কিন্তু টাকা ত আর লোকে দেবে না।—বলিয়া আর ক্ষণকাল অপেক্ষা না করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

মেজ-বৌ সেগুলি হাতে লইয়া কি সব ভাবিতে লাগিল।

গোবিন্দ নিজের সিল্কের জামাটা হাতে করিয়া একে ওকে তাকে দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। ঠাকুর-মার দ্বারের কাছে যাইয়া উঁকি দিল। তিনি গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—গবু, আয় না এখানে, দেখি তোর হাতে ওটা কি ? অমন লুকুচ্চিস্ কেন ?

সে ধীরে ধীরে ঠাকুর-মার কাছে আসিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার হাতের জিনিষ দেখাইতে চাহিল না। পিছন দিকে লুকাইয়া হাসিতে লাগিল।

—কি এনেছ দেখি না দাদা—বলিয়া তিনি বালকের কাছে সস্নেহ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সে একএকবার লতিকার দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইতেছিল যে সে দেখাইবে না। লতি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, এক দৌড়ে তাহার কাছে গিয়া তাহার হাত শুদ্ধ জামাটা ধরিয়া ফেলিল। গোবিন্দ চীৎকার করিয়া উঠিল। লতি ভয়ে হাত ছাড়িয়া দিল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার হাতের জামাটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং দুই পা অবিরত মেজেয় ঘস্‌ড়াইতে ঘস্‌ড়াইতে তারস্বরে কাঁদিতে থাকিল।

জামাটি দূরে খুকীর মূতে পড়িয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি সে তুলিয়া আনিয়া ঠাকুর-মার কাছে দিতে যাইবে, এমন সময় সেজ-বৌ হন্তদন্ত হইয়া তথায় ছুটিয়া আসিল। গোবিন্দর এবং জামাটার ঐ দশা দেখিয়া রাগে গোবিন্দেরই গালে-পিঠে খুব ঘা'কতক চড়াইয়া দিয়া বলিল,—বল্লাম হতভাগা ছেলেকে, লতিকে দেখাস্‌নি, ওধারে যাস্‌নি, তা নয়, সেই-সেই ধারেই আসা চাই—বলিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রহারও করিতে লাগিল। শাশুড়ী বাধা দিতে গেলে সেজ বলিল—আর থাক—অত দরদ জানাতে হবে না। কি হতভাগা মেয়ে জন্মেছে, নিজের যা-কিছু সুখ, সব ত রাক্ষসের মত খেয়েছেন, আবার এদের সুখও একটু

দেখতে সহ্য হয় না—বলিয়া লতির হাত হইতে ভিজে জামাখানি লইবার সময় গাল দুইটি সজোরে টিপিয়া দিয়া গেল। লতি চীৎকার করিয়া উঠিল। কাঁদিতে থাকিল।

কান্নাকাটি চেঁচামেচি শুনিয়া মেজ-বৌ সেদিকে আসিতেছিল; পথে সেজ-বৌকে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সেজ রাগে সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল—হিংসেয় মরে গেল, জামাটাকে মুতে জলে কাদায় করলে দেখ না! এই হতভাগাকে বল্লাম, ওঘরে যাস্‌নি, তবুও যাওয়া চাই। মেজ-বৌ বুদ্ধিমতী সেজ-জায়ের ব্যবহার তার প্রথম ঘর-করার দিন থেকেই জানে, অতএব আর কোন প্রশ্ন না করিয়া কেবল নতুন জামাটার জন্য সমবেদনা জানাইয়া, পুনরায় নিজের কক্ষে ফিরিয়া গেল।

লতি কাঁদিতে থাকিল; ঠাকুর-মা একটুও সান্ত্বনা দিলেন না, সেজ-বৌমার ব্যাবহারে ক্ষোভে ক্রোধে লজ্জায় তিনি মর্ম্মাহত হইয়া রহিলেন; কি করিবেন কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না। এমনভাবে কিছুক্ষণ কাটিলে কনক তাহার পূজার পোষাক লইয়া সে-ঘরে ঢুকিল। সে এত-কিছু জানিত না। সে আস্তে আস্তে লতির পার্শ্বে বসিয়া বলিল,—লতি কাঁদছিস্ কেন?—অ—লতি কাঁদচিস্ কেন? আমার সঙ্গে আড়ি ভাই, কথা কইবিনি? বেশ বেশ আমি কি করলুম ভাই?

তথাপি সে মুখে কাপড় গুঁজিয়া কাঁদিতে থাকিল। কনকের কোন কথার উত্তর দিল না। আরো কিছুক্ষণ সে সাধাসাধি করিল। তারপর কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল—লতি, তোকে বুঝি সেজকাকীমা পূজোর পোষাক কিনে দেন নি? তারপর চারিধার তাকাইয়া অপেক্ষা-কৃত নিম্নস্বরে বলিল, সেজকাকীমা ভারি দুষ্টু, বড্ড মারে।

ঠাকুর-মা কনকের সকল কথা শুনিতেছিলেন আর কাঁদিতেছিলেন।

ভাবিতে লাগিলেন,—সামান্য ক'বছরের ছেলের যা বুদ্ধি আছে, স্নেহ আছে, তার কণামাত্রও কি তার মায়েদের নেই। তিনি এতক্ষণ পরে কনককে বলিলেন, কনক, তুমি এখন যাও ত দাদা, ওর কান্না থামলে পরে এস'খন।

এমন সময় চরণ সে-ঘর ঝাঁটা দিবার জন্য ঢুকিল এবং তদবস্থায় তাহাদের দেখিয়া কনককেই সে প্রশ্ন করিল—কেন লতি কাঁদচেরে কন্‌কা? তুই বুঝি ওকে বকেচিস্?

কনক হতভম্ব হইয়া বলিতে লাগিল —বা আমি কেন বকতে যাব, তুমি ভারী মিথ্যেবাদী ত, হাঁ অমন মিথ্যে নামে দোষ দিও না বলচি—বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল। চরণ একগাল হাসি হাসিয়া তাহাকে আদর করিয়া বলিল, নারে আমি মিছে কথাই বলছিলাম, তুই কি লতিকে বকতে পারিস্, তুই যে লতিকে ভালবাসিস্—বলিয়া তাহার গাল ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

আদর পাইয়া কনক নিজ বুদ্ধিমত বলিল,—লতির পূজোর পোষাক হয়নি বলে ও কাঁদচে।

—হাঁ লতি, তাই জন্যে তুমি কাঁদচ? বেশ ত তাতে আর কি? কালই আমি তোমায় একজোড়া কাপড় কিনে দেব। ভয় কি দিদি? বুড়ো চর। যতদিন আছে, ততদিন তোমার ভাবনা কি? বলিতে বলিতে তাহার অশ্রু আকণ্ঠ ঠেলিয়া আসিল, সে কিছুই আর ইহার অধিক বলিতে পারিল না!

তারপর লতি এ-দুইজনের আদর সান্ত্বনা পাইয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া কি জন্যে সে যে কাঁদিতেছে ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাই তাহাদের নিকট বিবৃত করিল। এতক্ষণ ঠাকুর-মা নীরবেই ছিলেন, বলিলেন, যাও ত চরণ, নরেন কিংবা সুরেনকে জিজ্ঞাসা করে এস ত, লতি বিশুর জন্যে কিছু এনেছে কি না।

—না ঠাকুর-মা, কিছু আনেনি, বাবা মাকে বলছিলেন আমি শুনেছি।

ঠাকুর-মা একটি দুঃখের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তা আমি জানিরে দাদা—তা আমি জানি! বাপরে আমার, তোমার ছেলে-পিলেকে একবার দেখে যাও বাপ—বলিয়া পুত্রের জন্য, বড়বধূর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

চরণ কোন কথা না বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। ঘরে ঝাঁটা দিবার কথা, প্রদীপ সাজাইবার কথা ভুলিয়া দুঃখে-ক্রোধে সে বরাবর সেজবাবুর ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সেজবাবু তখন ঘরে ছিলেন না, সেজ-বৌ তখন খুকীকে দুধ খাওয়াইতেছিল, এমন সময় চরণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসু উদ্বিগ্ন নেত্রে তাহার দিকে চাহিল। চরণ গম্ভীর ভাবে বলিল,—সেজ-মা, লতির আর বিশুর জন্যে বাবু কি পোষাক এনেছেন ঠাকুর-মা দেখতে চাইলেন।

সেজ-বৌ খুকীর কাণ দুইটি মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, বাবু কি পোষাক এনেছে, তাত জানি না চরণ, আমায় ত কই দেখাননি তিনি।

—ওঃ বুঝতে পেরেছি, আপনি আনতে বলে দিয়েছিলেন তাঁকে?

—আমি কি আনিতে বলে দেব, তোমাদের সব কি পছন্দ তাত জানি না,—আর তাঁর হাতে শুনলাম টাকাও এখন বেশী নাই,—সেজ-বৌয়ের কথা শেষ হইতে না হইতেই চরণ সেখান হইতে চলিয়া গেল।

চরণ একেবারে বাহির বাড়ীতে গিয়া হাজির। নরেন সুরেন দুই ভায়েতে মিলিয়া প্রেস-সংক্রান্ত কি সব হিসাব পত্তর করিতেছিল। চরণ সহজভাবে বলিল,—সেজবাবু, আমার গতমাসের মাহিনাটা আর পূজোর পার্ব্বণীটা আজ দিতে হবে, আমার বড্ড দরকার। সেজ একবার মেজর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—পরশু নিস্ অ'খন। বলিয়া চুপ করিয়া পূর্ব্বের কার্য্যের জন্য কলম ধরিল। চরণ কিন্তু নড়িল না.

বলিল—আজ এখনই চাই-ই। আপনাদের সব পূজোর কাপড় চোপড় এলো, আর আমার বেলা পরশু, না, আমার এখ্‌খুনি দরকার।

মেজভাই তাহাকে চুকাইয়া দিতে বলিল। কারণ এখনই অন্য সব লোক এখানে আসিবে তাহাকে চুকাইয়া না দিলে; হয়ত বাড়ীর আরো সংবাদ তাহাদের সম্মুখে বাহির হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় মেজভাই একথা বলিল। সেজভাই কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাকে আট টাকা মাহিনার স্বরূপ এবং দুই টাকা পূজার পার্ব্বণী স্বরূপ, একটা লাল মোটা থোলে হইতে বাহির করিয়া দিল। থলে-ভর্ত্তি টাকা দেখিয়া চরণ যাইবার সময় আপন মনে বলিল,—এত টাকা, কেবল নতি আর বিশুর কাপড় কেনারই টাকা জোটে না।—সে আপন মনে বলিল বটে, কিন্তু কথা কয়টা তাহাদের দুই জনেরই মনে তীরের মত গিয়া বিঁধিল। চাকরের মুখে এরূপ কথায় একজনের রাগ হইল, একজনের লজ্জা হইল, অথচ দুইজনেই সহোদর।

বিশু একমনে সেজ কাকাবাবুর নতুন জুতায় কালি মাখাইতেছে। দুপুর বেলা কেহ কোনখানে নাই। ছোটরা সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বড়রা যে যাহার ঘরে খিল আঁটিয়া শুইয়া আছে বা অন্য কিছু কাজ করিতেছে। এমন সময় চরণ আহার সারিয়া বিশুর নিকট আসিয়া বসিল। কিছুক্ষণ কোন কথা বলিল না। বিশু বুঝিল, চরণ নিশ্চয় একটা-কিছু বলিবার জন্য আসিয়াছে। এইজন্য বিশু জিজ্ঞাসা করিল—কি চরণদা, আজ যে বড় এখানে এলে? আচ্ছা দেখত চরণদা, এ পাটিটা বেশ চক্‌চকে হয় নি? তবু সেজ কাকীমার মনে ধরে না, বলেন, বেগারের কাজ কিনা। আচ্ছা, তোমায় বলতে হবে চরণদা, এই

যাচ্ছে-তাই কালিতে এমন সুন্দর হয়েছে, এর চাইতে কি আরো বেশ হয়?

চরণ কথা কহিতে পারিল না, কেবল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—না। বিশু আর কোন কথা না বলিয়া পুনরায় জুতাতে কালি লাগাইয়া ঘষিয়া যাইতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে চরণ বলিল—বিশু, তোর সঙ্গে না হরিপদর ছেলের খুব ভাব আছে?

—আছে, কেন চরণ দা?—জান চরণদা, নিমাই এই ত অতটুকু ছেলে ত, কেমন লাঠি ঘোরাতে জানে, আমি এত চেষ্টা করি, কিছুতে এমনটি পারিনা। হাঁ চরণদা, শিখ্‌তে পারবো না?

—পারবি বইকি! তোর বাবা কি কম খেলতে পারতেন! ঐ হরিপদ কত চেষ্টা করতো হারাতে. কিছুতেই পারতো না। যেমন তিনি কুস্তি করতেন, তেমনি তিনি লাঠি খেলতে পারতেন।

—আচ্ছা চরণদা, বাবাকে নাকি দক্ষিণেশ্বর থেকে ধ'রে নিয়ে যায়?—কেন চরণদা, বাবা কি দোষ করেছিলেন? কবে আসবেন তিনি?

চরণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক্ হইয়া গেল, এ সংবাদ সে জানিল কোথা হইতে। বলিল—কে তোমায় এসব কথা বল্লে বিশু?

—তা কেন আমি বলবো, তুমি রোজ রোজ বল বলবো'খন, বলবো'খন, শুঃ ..মি যেন তোমার কাছে না হ'লে আর শুনতে পাব না!

—বাঃ বেশ গল্প হ'চ্ছে দু'জনে যে, একটা কাজ করবেন, তাও আবার পাঁচবার সাধতে হ'বে—খোষামদ করতে হ'বে। এখুনি সে বেরুবে, তা বাবুর যদি একটু হুঁস আছে। বলিয়া সেজ-বৌ রান্নাঘরে দুধের জন্য ঢুকিয়া পড়িল।

বিশু কোন কথা বলিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। চরণ বলিল,—সেজবাবু ত সেই সন্ধ্যে বেলা বেরুবেন।

সেজ-বৌ একথার উত্তর দিল—সন্ধ্যে হ'তে আর কত দেরিই বা আছে? বলিয়া দুধ বাহির করিয়া লইয়া নিজের কক্ষে যাইয়া খিল দিল।

তখনও বৈকাল হয় নাই! বিশু নিজের কাজ শেষ করিয়া উঠিল। হাত ধুইয়া গামছায় মুছিতে মুছিতে বলিল,—পরশু সপ্তমী নয় চরণদা?

চরণ বলিল,—হাঁ। দেখ্ বিশু, আমায় দু-খানা কাল-পেড়ে কাপড় হরিপদবাবুর দোকান হ'তে এনে দিতে হবে। তুই নিমাইকে বল্‌লে সে নিশ্চয়ই সস্তা ক'রে দেবে।

বিশু বলিল—তা দিতে পারে, সে আমায় বড় ভালবাসে। কিন্তু ভুলো কি বলে জান চরণদা?—বলে ওর সঙ্গে মিশিস্‌নি, পুলিশে ধ'রে নিয়ে যাবে! ভুলো-নন্তু এরা আমার সঙ্গে তেমন ভালো ক'রে মেশে না।

চরণ দুঃখিত হইয়া বলিল—তা না মিশু'ক বড় ব'য়ে গেল, তুমি এক কাজ করো দিকিন্, আমার ঐ দুটো কাপড় এনে দিও, আমি সঙ্গে যাব'খন!

—তাদের দোকানে কিন্তু মোটা মোটা কাপড়—

—ঐ কাপড়ই ভাল, ঐ কাপড়ই তোমার বাবা পরতে ভালবাসতেন।

—আচ্ছা, আমি তবে আসি হাতকাটা জামাটা প'রে—বলিয়া অন্য কোন প্রশ্ন না করিয়া সেথা হইতে সে চলিয়া গেল।

বিশু জামা পরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় ঠাকুর-মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোথা যাচ্ছ দাদা?

—হরিপদবাবুর দোকানে, চরণদাকে দু'খানা কাপড় কিনে দিতে হ'বে।

মুরুব্বির মত তাহার বলার ধরণ দেখিয়া ঠাকুর-মা হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—চরণকে ডেকে আনো আগে, তারপর দোকানে যেও।

বিশু চরণকে ডাকিয়া আনিল। ঠাকুর-মা প্রশ্ন করিলেন,—চরণ! দু'খানা কাপড় তোমার কি হবে?

চরণ একগাল হাসিয়া বলিল,—যাই হোক না মা, আপনার তাতে দরকার কি! এস বিশু, চলে এসো।

ঠাকুর-মা বিশুর হাত ধরিয়া বলিলেন,—দেখ চরণ! আমি সব শুনেছি, তুমি কাল টাকা চেয়ে নিয়েছ মাইনের, ওদের সেই টাকায় কাপড় কিনে দিতে তুমি পারবে না বলে দিচ্ছি।

—বিশু, তুমি চলে এস না! ওসব কি কথা শুনচ।—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে তাহাকে চলিয়া আসিবার ইঙ্গিত করিল। কিন্তু ঠাকুর-মা বিশুকে ছাড়িলেন না, হাত ধরিয়া রহিলেন। বলিলেন—তুমি গরীব মানুষ, তুমি কোথা থেকে টাকা পাবে বলতো? এতদিন হ'লো, তোমায় একখানা ভাল কাপড় কি গামছা দিতে পারলেম না, আর তুমি ঐ বারটা টাকা—আর বলিতে পারিলেন না। অশ্রুতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

তাহা শুনিয়া চরণের মুখের হাসি মুখে মিলাইয়া গেল। বলিল,—মা. আজকাল তেমন কিছু পাচ্ছি না ব'লে আমার ত একটুও দুঃখ হয় না। বড়বাবু যখন ছিলেন, তখন ত কত পেয়েছি, কত নিয়েছি—আবার তিনি ফিরে আসবেন কত নেব, কত পাবো—তখন এই চরণকে দেখে নিও, যদি সে একটিও কুটো নাড়ে তবে সে কৈবর্তের ছেলেই

না।—বলিয়া একবার চোখ মুছিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল—বড়বাবুর যাবার আগে কি আমায় বলেছিলেন জানতো, মনে আছে ত—এই বিশু আর লতি রইলো; এদের মা নেই, বাপও আজ থেকে এরা হারালে, কিন্তু তাতেও আমার কোন দুঃখ নেই চরণ, তুমি আছ, তুমি এদের মা-বাপ হয়ে থাকবে তাও জানি; কিন্তু তবু বলি, এরা আর মা যেন কোন দিন বেঁচে থাকতে কষ্ট না পান। দেখিস্ খুব হুঁসিয়ার—যেন এসে তোদের আবার এমনটিই দেখি।

চরণ ও ঠাকুর-মা দু'জনই বিশুর পিতার জন্মে চোখের জল ফেলিলেন। চরণ পুনরায় বলিল,—সে কথা মা কেমন ক'রে ভুলবো? সেজবাবু মেজবাবু থাক্তে আমাকেই বা ওকথা কেন বল্লেন! আমি একটা চাকর বইত নয়! ঐ কথার কাছে বারটা টাকা কি এতই বড় মা? তিনি কা'দের জন্মে জীবনটা দিতে গেলেন; আর আমি এমন পাপী যে, তাঁর ছেলে মেয়ের জন্মে আজ পূজোর দিনে এক জোড়া কাপড় দিতে ম'রে যাব? এস বিশু, আর দাঁড়িয়ে ভেবো না, শিগ্‌গির চলে এস! বিশু বড় হ'লে যখন পয়সা আন্‌বে, তখন অমন কত বার টাকার পানই খেয়ে ফেলবো।—বলিয়া সাশ্রুনয়নে জোর করিয়া হাসিতে হাসিতে চরণ চলিয়া গেল।

চরণের কথা শুনিয়া মাতৃহৃদয় উথলিয়া উঠিল। এতদিনের রুদ্ধ অশ্রুতে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মায়ের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিল—এসো, বাপ, ফিরে এসো, দেখ তোমার পুত্র-কন্যারা আজ পথের ভিখারী! তাদের দু'খানা বস্ত্র দেবার জন্মে এবাড়ীতে কোন প্রাণীই নাই! ভগবান! চরণকে আমার চিরজীবী কর। আমি যাই দুঃখ নেই, কিন্তু সে যেন থাকে! তাকে বাঁচিয়ে রেখো।

বন্ধুর স্মৃতি

তিন দিন ধরিয়া মা আনন্দময়ীর পূজা হইল। আজ বিজয়া। শরতের সকল আনন্দ যেন পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লতির ঠাকুর-মা আজ নিজ হাতে সকলের খাবার সাজাইয়া রাখিয়া বসিয়া আছেন। পাড়ার সকলেই আসিয়া আজ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া যাইবে। মিষ্টি-মুখ করাইতে হইবে, সেইজন্য সমস্ত আয়োজন করিয়া বসিয়া আছেন। লতি চরণের দেওয়া খদ্দরের কাপড়টা পরিয়া পাশেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

একে একে অনেকেই আসিল। নমস্কারাদি করিয়া সবাই চলিয়া গেল। ও-পাড়ার তিনুর মা তাহার বৌকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর একমুখ হাসি হাসিয়া বলিল,—আর কি তেমন গতর আছে দিদি, এতটা পথ কি আর চলা সাজে—আমার, কি করি বছরের একটা দিন, তাও যদি পায়ের ধূলো না পাই ত বাঁচি কি ক'রে? —বলিয়া নিজে পায়ের ধূলা লইয়া বৌকে পায়ের ধূলা লইতে ইঙ্গিত করিল।

তারপর মিষ্টিমুখাদি হইয়া গেলে তিনুর মা বলিল,—তিনুও খানিকক্ষণ বাদে আসবে'খন? বিশু কৈ? ঐ লতি বুঝি ঘুমুচ্ছে, থাক্—থাক্, আর জাগাতে হ'বে না!—আহা—ছেলে-মেয়ে কোথা, আর—আর বলিল না, ইহাতেই দুই বৃদ্ধার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

আজ এমন দিনে হীরেন কোথায়ও কোন দেশেই থাকিত না। আজ যে তার মায়ের পায়ের ধূলা লওয়া চাই-ই চাই। আজ প্রায় দুই বৎসর জেলে—এই দুই বৎসরের মধ্যে দুইদিনও সে আসিতে পারে নাই! তাহার মায়ের পদধূলি লইতে পারে না। আজ যে এ দুঃখ তাহার মাতার হৃদয়ে শেলের মত বিঁধিতেছে! ঠিক তেমন দুঃখই কি সেই সুদূরেও তাঁহার ছেলের বুকে বিঁধিতেছে না?

এমনই গভীর দুঃখ বুকে চাপিয়া তিনি সকলকেই প্রসন্ন হাসিমুখে মিষ্টিমুখ করাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দ্বারের প্রান্তে দুইটী ছায়া দেখা গেল, একটি বিশুর, অপরটি মতিলালের ছেলে হারুর। বিশু আসিয়া ঠাকুর-মার পায়ের ধূলা লইয়া হারুকে ডাকিল। সে কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিল না—সেখান হইতেই প্রণাম করিল। ঠাকুর-মা ভিতরে আসিবার জন্য বলিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই আসিল না।

মার অমনি পুত্রের কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহারও ত এমন কত ছোটো জাতের ছেলের সঙ্গেই আলাপ ছিল—এমনি বিজয়ার দিন সেও ত আসিত তাহাদের সঙ্গে লইয়া—এমনি প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে পুত্রের মুখ আজ মায়ের প্রাণে ব্যথা দিতে লাগিল।

সেদিন খুব খট্‌খটে রৌদ্র উঠিয়াছে। ছাদের উপরে বালিশ-বিছানা, কাপড়-চোপড়, গদি-তোষক, আচার-কাসুন্দি প্রভৃতি রৌদ্রে দিবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। ঝি-চাকররা আজ আর খাওয়ার পর দুপুরে তেমন বিশ্রাম পাইবে না। প্রত্যহের মত বিশুদের বাড়ীর সকলেই যে-যার ঘরে নিদ্রা যাইতেছে; কেবল ছাদের উপর চরণ আর সেজ-বৌয়ের ঝি হারানী। একটা প্রকাণ্ড গদীর ঘাঁঝে ঘাঁঝে যে সব ছার-পোকা এতকাল লুকাইয়া মনিব-গৃহিণী বা কর্ত্তার রক্ত-শোষণ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে সন্তান-সন্ততি লইয়া বসবাস করিতেছিল, তাহারা দু'জনে তাহাদের টিপিয়া টিপিয়া রক্তটুকু বাহির করিয়া ফেলিতেছিল এবং তৎসঙ্গে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা-বার্ত্তা বলিতেছিল।

চরণকে বাড়ীর ছেলে-পিলে সবাই "চরণ-দা" বলে, অপর ঝি-

চাকরেও তাহাকে ঐ বলিয়া সম্মান প্রদান করে। হারানী রক্তে টুবুটুবু একটি ছারপোকাকে টিপিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—আমাদের যে মনিবের কথায় রক্ত জল হ'য়ে যায়, আর তার রক্ত এতটা খাওয়া হ'য়েছে?—ধন্যি তোদের সাহস বাপু!

চরণ হাসিতে লাগিল। চরণ বহু পুরাতন, হারানী সবে মাত্র কয়েক মাস আসিয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যেই সে তাহার মনিবের সমস্ত হাল-চালই বুঝিয়া লইয়াছে। তাই হাসিতে হাসিতে ছারপোকাকে উদ্দেশ করিয়া অমন কথা কয়েকটা সে বলিতে পারিয়াছে!

হারানী বলিল,—আচ্ছা চরণ-দা, এই ছ'বৌয়ের মত কি বড় বৌদিও ছিলেন নাকি?

চরণ জিভ্ কাটিয়া বলিল,—কি বলিস্ হারানী, কা'তে আর কা'তে! তোর যেদিন হাতটায় বিছে কামড়েছিলো,—সে রাত্রি সবাই ত নিশ্চিন্তি হ'য়ে ঘুমালো—আর তুই ছট্‌ফট্ করতে থাকলি সমস্ত রাতটা! আর ঐ দেখ্‌তিস্ বড়-মা থাক্‌লে, সারা রাত ত ঘুম হ'তই না তাঁর, জেগে বসে থাক্‌তেন—আর কি রকম কাঁদ্‌তেন দেখ্‌তিস্। হারানী, সে ভাগ্য নিয়ে তুই জন্মাস্‌নিরে, জন্মাস্‌নি। বড়-মাকে ছেড়ে আমি কখনও দেশে যেতে পারিনি হাসিমুখে। বড়-মা যেদিন গেলেন, সেদিন আমি সত্যই মা-হারা হ'লাম।—বলিয়া আর কোন দ্বিতীয় বাক্য তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না, কেবল টপ্ টপ্ করিয়া তাহার চোখ দুইটি হইতে কয়েক ফোঁটা অশ্রু সেই গদিটার উপর গড়াইয়া পড়িল। হারানী সে মনিবকে দেখিবার কিংবা তাঁহার আদর পাইবার ভাগ্য লইয়া জন্মায়নি, তথাপি চরণের দুঃখেই বোধ হয় তাহারও নয়ন-কোণে জল দেখা দিল।

ক্ষণকাল পরে হারানী বলিল,—চরণ-দা, আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই—এমন মনিবের কাছে কাজ করার পর আবার এখন এমন মনিবের কাছে

কাজ কর কি ক'রে ? বাবা কি মুখ, ঢের ঢের মেয়ে মানুষ দেখেছি বটে !

—সাধে কি রে হারানী, সাধে কি করি, ঐ ছেলে মেয়েটার জন্যে, ঐ ছেলেমেয়েটার জন্যে ! বাবু ফিরে এলে, তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে দেশে চলে যাব—উঃ ! আমি আর পারি না হারানী, আমি আর পারি না।

—বাবু জেলে গেলেন, কেন চরণদা ? সেজমাকে সেদিন জিজ্ঞাসা করলাম, বললেন—কি সব চুরি ডাকাতি করেছিলো কে জানে !—আমি বলি ভদ্রলোকে কি আবার—

রাগে চরণ চোখ দুইটী তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়াই হারানীর দিকে ফিরিয়া বলিল,—দেখলি হারানী ! সেজমার সয়তানিটা দেখলি ! হায়রে হায় ! অমন আমার সুন্দর মনিব, তিনি কিনা চুরি ডাকাতি করেছেন—আক্কেলটা দেখ্‌লি ?

হারানী চরণকে বুঝাইয়া বলিল—দেখ চরণদা, মেয়েমানুষের ও-সব সয়তানি আমি ঢের দেখেছি, তুমি বেটাছেলে, কি আর বুঝবে বল ? আক্কেল আছে, সবই আছে, নেই কেবল পরকে ভালবাসার প্রাণটা,—কর্ত্তা গিন্নীতে মিলেছেও বেশ।—থাক, ও-সব ছেঁচড়া মনিবের কথা। সেদিন শুঁড়ি-পুকুর থেকে দু'খানা বাসন মেজে আনছিলাম, শুঁড়ীদের ঝি বললে,—কি হারানী, হীরেন বাবুদের বাড়ীতে কাজ করচিস্ বুঝি—তা বেশ—তা বেশ, কিন্তু ওবাড়ীতে চাকরীর এখন আর সে সুখ নেই—সে কর্ত্তাও নেই, সে গিন্নীও নেই। তারপর কত কথা বললে। তারই কাছ হ'তে ত শুনি, বড়বাবু জেলে গেছেন।

—শুনলি ত হারানী, শুনলি, এ ত আর আমার মুখে শুনা নয়, ওরা সবাই বলে—বড়বাবু আর বড়মার গুণের কথা হ'লে আমি যেন শতমুখ্ হ'য়ে বলি—আরে, যাঁর গুণ আছে, তাকে কি আর লুকিয়ে রাখা যায়—

সকলেই তাকে ভাল বলে—সামনে না বলুক আড়ালেও বলবে, কি বলিস্ হারানী ?

—তাঁ'ত নিশ্চয়ই—একবার বলতে—একশ' বার।

—কি করি বল্ হারানী, এই বুড়ো হাড়ে সব সহ্য করতে হয়, সব সহ্য করতে হয় ;—এই যে এত পয়সা সেজবাবু উপায় করেছেন, সে সব ঐ বিশুর বাপের দৌলতে, জানিস্। এমন দিন গেছে হারানী, বড়বাবু কাপড় জামা এনে দিয়েছেন ত ঐ সেজবাবু মেজবাবু তবে পরতে পেয়েছেন। আমি মরিনি হারানী, আমি মরিনি—আমি সব জানি। এখন তাঁর ছেলে কিনা মেজবাবু সেজবাবুর জুতো পরিষ্কার করে, আবার একটু চক্চকে না হ'লে মারধর ; আর তাঁর ঐ কচি দুধের মেয়েটা সে কিনা সেজ-মা'র মেয়ের চাকরাণী—গু'মূত সাফ করে,—দেখে দু'চোক দিয়ে জল আসে, পারি না দেখ্তে, তাই সেখান হতে চ'লে যাই। আমি এত বুড়ো ছিলাম না হারানী ! ওদের কষ্ট মনে মনে সহ্য করেই আমি আরো বুড়ো হয়ে গেলাম।

হারানী সমবেদনার স্বরে বলিল,—চরণদা ! তুমি একবার দেশে ঘুরে এস কিছুদিনের—

—হারানী ! তুই পাগল হ'লি, বড়মা বেঁচে থাক্তেই বছরে একবার প্রাণ ধ'রে তাই দেশে যেতে পারতাম না, তা এখন, হা—আমার বরাৎ ! বড়বাবু যেদিন জেলে গেলেন, সেদিন থেকেই আমার দেশে যাওয়া ঘুচে গেছে, এখন এঁরা যদি আমায় লাথি ঝাঁটা জুতো মেরেও তাড়িয়ে দেন, তবুও আমার এখান থেকে নড়বার হুকুম নেই, হারানী ! আমি এখানে এ জন্মের মত বাঁধা প'ড়ে আছি—আমার আর দেশও নেই, ঘরও নেই, এরাই আমার দেশ, এরাই আমার ঘর বাড়ী সব। বাবু কবে যে ফিরবেন—ততদিন কি বাঁচবো হারানী ? আর দেখ্, মা কালীর ইচ্ছেয়

যদিবা নাই বাঁচি, তুই তখন দেখিস্ হারানী এদের, এদের মা-বাপ কেউ নেই, এরা বড় অনাথা। আমি সেদিন লুকিয়ে দেখেছি হারানী, তুই সেদিন লতির হাতে একটা সন্দেশ দিলি ; আজ ক'বছরের ভেতর এমন অতটুকু আদরও করতে কাউকে দেখিনি এবাড়ীতে। কেবল বুড়ী ঠাকুর-মা বেঁচে আছেন তাই রক্ষে।

—সাধে কি আর দিলাম চরণদা,—বাড়ীতে তত্ত্ব এলো, ছেলে বুড়ো ঝি-চাকর সবাই পেলে, আর ওমেয়েটা কিছু বোঝেনা ব'লে ঐ বাদ গেল! তোমার দিব্যি বল্‌ছি, সেদিন কাঁচের গ্লাসটা সেজ-মা নিজে ভাঙ্গলেন—বল্লেন কিনা লতিই ভেঙ্গেচে, সেদিন দুধের সরটা নিজের মেয়েকে রান্নাঘর থেকে লুকিয়ে খাইয়ে আন্‌লেন, তারপর মেজ-মা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মেয়ের দুধের সর কে খেলে, সেজমা দিব্যি বললেন, লতি রান্না-ঘরে ঢুকেছিলো, তা' হ'লে লতিরই কাজ। লতি কেঁদে ফেলে বললে,—না মেজ্‌ কাকীমা, আমি খাইনি ; অমনি সেই কথার উপরেই মুখ কি ঠোকানই ঠুকে দিলে দেওয়ালে, ঠোঁট কেটে রক্ত বেরুতে লাগ্‌লো। সেজবাবু এসে লতির মুখে নেকড়া বাঁধা দেখে বললেন,—কি হ'য়েছে ওর, তখনও বল্লেন, প'ড়ে গিয়ে কেটেছে ; আমি ত চব্বিশ ঘণ্টাই সেজ-মার মুখে মুখে আছি, আমায় ত কিছু লুকোবার নেই। তাই ত মাঝে মাঝে ভাবি চরণদা, কি ভাগ্য নিয়েই না ওরা জন্মেছিল—বলিয়া সে নিজের চোখ দুটি মুছিল।

চরণ এতক্ষণ তার কোন কথায়ই বাধা দেয় নাই। এমন ছোট খাট দুঃখের—শাস্তির কথা সে যে জানে না বা দেখে নাই, তাহা নহে ; কিন্তু এমন সমবেদনার সহিত সেই সব দুঃখের কথা আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহার সম্মুখে এমনভাবে ব্যক্ত করিতে পারে নাই, বা করে নাই। চরণের মনপ্রাণ আজ ভাঙ্গিয়া গেল। সে হারানীর উপর তার

প্রাণের সমস্ত কথা, সমস্ত গোপন বেদনা উজাড় করিয়া দিতে বসিল।

চরণ নিজের গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া বলিল,—তা' তুই যা' বলিস হারানী—ভাগ্য ওদের খারাপই বটে, কিন্তু, অমন বাপ-মা ক'টা লোকের হয় বল্‌ত ?—যেদিন বড়বাবু রেলে ক'রে জেলে চ'লে গেলেন, সেদিন ষ্টেশনে লোকের ভিড় ধরে না, ফুলের মালায় তাঁর গলা ভ'রে গেল। আচ্ছা বল্‌তো হারানী, চুরি-ডাকাতি কর্‌লে কি লোকে অমন ক'রে পূজো করে ? হাতে হাত-কড়া পরে ঢের চোরকে ত নিত্যি দেখেছিস্ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে ?

হারানী বলিল,—ঢের ঢের।

—বাবু মোটা কাপড় পরতেন, শুধু পায়ে থাক্‌তেন, মাছ-মাংস খেতেন না। কেবল তাঁর মুখে 'দেশ আর দেশ', 'বন্দে-মাতরং' করে মেতে থাক্‌তেন, নিজের ছেলে-পুলে পড়ে রইলো—কে দেখে তার ঠিক নেই, বন্দে-মাতরং—

হারানী বলিল,—তিনি খুব স্বদেশী ছিলেন বুঝি ?

কারাদণ্ডিত মনিবের উপর বিরক্তি এবং অভিমান প্রকাশ করিয়াই বোধ হয় চরণ বলিল,—কি জানি কি স্বদেশী—না ফদেশী, মাথামুণ্ডু,—তিনিই জানেন!—'দেশ'—দেশ ত আমারও আছে হারানী, আমি ত তাঁরই জন্যে আজ দেশ-ছাড়া, তাঁর চাকরীর, তাঁর সেবার জন্যই ত আমি সব ভুলে আছি ; আর তাঁর নিজের ছেলে-পুলে বড় হলো না—আমরা কেউ নয়—দেশ বড় হ'লো। ঐটেই ছিলো বাবুর দোষ।

হারানী ভক্তি-আপ্লুতস্বরে কহিল,—আমরা মুখ্যু সুখ্যু চরণদা—আমরা ওসবের কি বুঝি, বল ? তিনি যদি ভাল কাজই না করবেন ত অতো লোকে পূজোই বা করবে কেন ?—বলিয়া নিজেই তাঁহার অপরিচিত মনিবের উদ্দেশে দুই হাত কপালে ছোঁয়াইল।

চরণ পুনরায় সভক্তিস্বরে কহিল,—তা জানি হারানী, আমার রাগ হয় না, তুই বল্, এই বুড়ো হাড়ে আমি কি এদের সামলাতে পারি ?

—তা'ত বটেই ; তা'তে আবার অমন চেড়ীদের হাত হ'তে ?—মাঝে মাঝে সেজ-মার কথা ভাবি, আর মনে হয়—আমি মন্দ মেয়েমানুষ ছিলাম, ঢের পাপ কাজও করেছি—কিন্তু মেয়েমানুষ হ'য়ে অমন মন নিয়ে যেন না জন্মাতে হয়। যাঁর নুন খাচ্ছি, তাঁর নিন্দে করতে নেই—কিন্তু না বলেও ত থাক্‌তে পারি না—অমন পাষাণী, অমন কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলতে আমার চৌদ্দপুরুষেও পারবে না।

—পাষাণী ব'লে পাষাণী—যে বড়-মা তোদের জন্যে প্রাণটা দিলে, যে বড়বাবুর প্রেসের পয়সার এখনো সবাই মানুষ হচ্ছিস্—তাঁর ছেলেমেয়ে—তোদের একটু দয়া-মায়া পাওয়া তো দূরের কথা—কেবল মার খেতে খেতে আর চাকর-চাকরাণীর কাজ করতে করতে তাদের জীবনটা গেল। বল্‌লে হয়তো বিশ্বেস্ কর্‌বিনি—লতি একবারও ওদের কখনো কোলে উঠেনি আজ পর্য্যন্ত। ছোট বেলায় আমার যখন কোলে উঠ্‌তো লতি, তখন সে আর নামতে চাইতো না। বাবুর কোল থেকেও না। বাবুকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, কতদিন রাত্রি জেগেছেন তাকে কোলে নিয়ে। এমন এদের ভালবাসতেন। কিন্তু ভাবি, কি ক'রে এদের ছেড়ে তবুও অমন হাসিমুখে জেলে গেলেন। একদিন মায়ের পায়ের ধুলো না নিলে যাঁর খাওয়া হতো না—তাঁর আজকে কেমন করে চল্‌চে বলতো ? সে কষ্ট কি আমি বুঝতে পারি না ?—মা স্বর্গে যান—ছেলেগুলো মানুষ হো'ক—মেয়েটার বে' দাও—তারপর কর না যত পারো স্বদেশী, দেশ, বন্দে-মাতরং ; কেউ ত কিছু বলতে যাবে না, কেউ ত কিছু কষ্ট পাবে না। এখন কে এসব দেখে বল দেখি, আমিই বা ক'দিন আছি ? ঠাকু-মা ত গেলেই হয়।

বন্ধুর স্মৃতি

—বুলি বেলা যে পড়ে গেল হারানী—কখন ঘর দোরে ঝাঁটা পড়বে? খালি আলিস্যি, খালি কুড়েমো—ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে দিতে হয় অমন ঝিকে। সেজ-বৌ একথা বলিয়া গা ধুইতে চলিয়া গেল।

সত্যই আজ কথায় কথায় বেলা পড়িয়া গিয়াছে। বড়বাবুর কথা পেলে চরণের আর জ্ঞান থাকে না। সেও বেলার দিকে চাহিয়া দেখিল, —সত্যই আজ তাহাদের অন্য কাজের অবহেলা হইয়াছে। মনে মনে দোষ স্বীকার করিয়া লইয়া কোন কথা না বলিয়া তাহারা ছাদ হইতে বিছানা-পত্তর নামাইতে লাগিল। কাজের ফাঁকে চরণ বলিল,—কাল আবার বলবো'খন।

হারানী বলিল,—আচ্ছা। তারও ওসব কথাগুলি বেশ লেগেছিল; সেও জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্টে এত বড় হইয়াছে কিনা?

একদিন দুপুর বেলা আবার তাহারা দুইজনে ছাদে বসিয়া গল্পগুজব করিতে লাগিল। আজ আর হাতে তেমন কাজ নাই। আলি-সার ধারে ছায়ায় বসিয়া হারানী সুপারি কুঁচাইতেছিল—আর চরণ ছাদের সিঁড়ির ঘরের দরজায় বসিয়া তুলা পিঁজিতেছিল। হারানী জিজ্ঞাসা করিল,—ও তুলায় কি হবে চরণ-দা?

—কি জানি দিদি, চরকায় নাকি সুতো কাটা হবে; বিশুবাবুর বাপের মতই সখ!

হারানী বলিল—ওকে কখন ত পড়তে তেমন দেখিনি!

—কেন, সে ত রোজ অনন্তবাবুর ছেলের মাষ্টারের কাছে পড়তে যায়।

—তা হবে, বাড়ীতে কি স্কুলে ত তেমন যেতে দেখিনি।

—ওদের যে এখন গ্রীষ্মের ছুটি কিনা—বলিয়া চরণ হাসিল।

—উঃ। আমি বলি বুঝি লেখা পড়া—

—নারে না, বাবু থাকতে ঐ অতটুকু ছেলেরই দু'দুটো মাষ্টার ছিলো। এখন সে রামও নেই, সে রাজত্তিও নেই।—ভাগ্যে অনন্তবাবুর ছেলে সাধু ওকে বড্ড ভালবাসে, তাই একটু লেখা পড়া হচ্ছে; না হ'লে ত এখানেই ওর সব সাঙ্গ হ'য়ে যেত। পুলিশের ভয়ে ত প্রথম প্রথম কেউ ওর সঙ্গে মিশ্‌তোই না!—অনন্তবাবু খুব ভাললোক—বড়-বাবুর বন্ধু, তাই ছেলেটার কিছু হচ্ছে।

—হাঁ, হাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে–সেই সেদিন ঘোষালদের বাড়ীতে অত পুলিশ এসেছিলো কেন, বল দেখি—ওদেরও কোন্ বাবু নাকি খুব স্বদেশী, তাই।

—নিশ্চয় সে আর বলতে—মতিবাবু যে একজন বড় বাবুর দলের লোক কি না? এ গ্রামে বড় বাবুর সঙ্গীও দু'চার জন ছিলেন কি না? তোকে যে-কালে সেই সেদিন এত কথা বলেছি এ কথাটাও বলি শোন—কিন্তু দিব্যি করতে হবে কাউকে বলতে পারবি না—তুই নেহাত তার ছেলে মেয়ে দু'টোকে বড় ভালবেসেছিস্, তাই বলচি, আর আমি না থাকলে তোকেই ত এদের ভার নিতে হবে কিনা, আমি আর কারুর হাতে প্রাণধ'রে এদের দিয়ে যেতে পারবো না।—বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল।

শুনিতে শুনিতে হারানীর নয়নও অসিক্ত রহিল না। তাহারও কোন ছেলে মেয়ে ছিল না, তাই তাহার তৃষিত প্রাণও ব্যাকুল হইয়া কেমন-একটা অজানা করুণ রসে ভিজিয়া গেল। সজল কণ্ঠে কহিল—জীবনে ঢের পাপ করেছি, ভয় নেই চরণ-দা, আর পাপ বাড়াতে সাহস হয় না।—আর যা কাজ করি, ওদের আমি কোন দিন সজ্ঞানে কোন কষ্টে ফেলবো না, তাতে যা দিব্যি করতে বল করছি।

মনে মনে হারানী কাহার উদ্দেশে যেন ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল—

—তা কি আর জানি না, তুই ওদের কত ভালবাসিস্—না না, তোকে কোন দিব্যি গালতে হবে না—তোকে আমি খুব বিশ্বাস করি।

কিছুদিন পূর্ব্বে সে হারানীর সম্বন্ধে এত উদার হইতে পারিত না। তাহাকে বিশ্বাস করিয়া এত গোপন কথাও বলিতে পারিত না। কিন্তু কেন-জানি তাহার প্রাণের কোন সুপ্ত তারে সে আঘাত করিয়া তাহার এতদিনের গুপ্ত ব্যথার সুরকে এমন ভাবে সে বাজাইয়া তুলিতে পারিয়াছে যে, তাহার আজ হারানীকে বিশ্বাস করিতে কোথায় এতটুকুও বাধিতেছে না।

হারানীর পূর্ব্ব ইতিহাস এত ঘৃণিত যে, তাহাকে সেদিন কেহ তাহার চরিত্র সম্বন্ধে, এমন কি একটা মুখের কথাতেও কেহ প্রাণ ধ'রে বিশ্বাস করিতে পারিত না। আশ্চর্য্য, আজ তাহার কাছে চরণ তাহার প্রাণের গোপন-কথা উজাড় করিয়া দিতে চায়! কিসের জোরে! বিশ্বে এ এক অপূর্ব্ব রহস্য!

চরণ বলিয়া যাইতে লাগিল—বড়-মা মারা যাওয়ার পর বড়বাবু কি-এক রকম হ'য়ে গেলেন; দক্ষিণেশ্বরের বাগানেই তিনি কিছুদিন বাস করতে লাগলেন, আমি তখন তাঁর প্রেসের কাগজ আর পুরুফ নিয়ে বাগান আর প্রেসঘর করতে থাকতাম। এই ছিল আমার কাজ। আমাকে ব'লে দেওয়া ছিলো আমি কোথায় থাকি কেউ যেন সন্ধান না পায়, কেউ জিজ্ঞাসা করিলে বলিস্ আমি জানি না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কেন বড়বাবু! তার উত্তরে তিনি ছলছল নেত্রে বলেছিলেন—পুলিশে যদি কোন দিন জানতে পারে বা আমায় ধরতে পারে, তবে জন্মের মত আমায় হারাবি—চরণ! কি কাজ করতেন, আমি জানতাম না, তবুও ভয়ে আমার প্রাণ কেঁপে উঠতো; কতবার

বলতাম—বাবু বাড়ীতে এসে থাকুন, ঠাকুর-মা বড় কান্নাকাটি করেন—ছেলে মেয়ে দু'টো—কথার মাঝেই বলতেন—সব জানি চরণ, আমাকে অনেক মায়ের কান্না, অনেক ছেলেমেয়ের কান্না—ঘোচাতে হ'বে। তাঁর চোখ আবার ছলছল্ করে উঠ্‌তো—আমি কিছু বুঝ্‌তে তেমন পারতাম না, চুপ করে থাকতাম।

হারানী অন্যমনস্ক হইয়া বলিল—কি করতেন তিনি ?

—কি করতেন, তা আমি কিছুই জানতাম না, তবুও আমার মনে হ'তো কি যেন ভয়ানক কিছু তিনি করতেন। বাগানে একটা লুকান আমাদের দ্বার ছিলো, একদিন রাত্রে তা দিয়ে ঢুকছি—শুনতে পেলাম বাবু আর একজন বাবুকে—তার নাম শিশির না কি এমন হবে—বলচেন, তুমি যাই বল শিশির, তোমার চেয়ে, এমন কি পৃথিবীর সকলের চেয়েও আমি—চরণকে বিশ্বাস করি, ভালবাসি, সে আমার চাকর নয়—সে আমার একমাত্র প্রাণের বন্ধু। এ যদি না আমি ভাবতাম—প্রাণে বিশ্বাস করতে না পারতাম ত আমি আমার জীবনের মরণ-বাঁচনের সমস্ত ভার আজ তা'র হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তে এখান হ'তে সমস্ত কাজ করতে পারতাম না। জানি, তাকে যদি ধরে পুলিশে, আর সে যদি আমার বাসা বলে দেয়, হয়ত আমার সব শেষ হ'বে। কিন্তু, একথা সে প্রাণ থাকতে বলবে না, সে বিশ্বাস আছে, শিশির—আছে। আর সে যদি বিশ্বাসঘাতকতাই করে কোন দিন, জান্‌বো পৃথিবীতে দয়া-স্নেহ নেই ; আছে কেবল পাপ ! এমনি আরও কত কথা প্রায়ই শুনতাম, শুনে শুনে আমার কাণে প্রাণে আজও লেগে ছেয়ে আছে। আমি বিদ্বান্ ছিলাম না, শুনে শুনে এসব কথার মানে আমি বুঝে নিতে পারতাম ; কিন্তু ছাই ঐ দুটো কথার মানে বুঝতে পারতাম না—কি যে ছাই-পাঁশ দেশ-দেশ আর বন্দে মাতরং করতেন, তা তাঁরাই জানেন।

চরণ এতগুলি গুপ্তকথা বলিয়া কিছুক্ষণ থামিল। মনে মনে তাহার সুদূর কারাদণ্ডিত প্রাণের মনিবকে প্রণাম জানাইল। হারানী জিজ্ঞাসা করিল,—তারপর ?

—তারপর একদিন ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করে বৃষ্টি পড়্‌চে, বর্দ্ধমানের একটা বড় রাস্তায়—আমি প্রায় প্রত্যেক বড় বড় বাড়ীতে একটা ক'রে কাগজ মেরে যাচ্ছি, তা'তে কি লেখা ছিলো ভগবানই জানেন ; এমন সময় একটা পুলিশ না-পাহারাওয়ালা এসে আমায় ধরলে। অনেক কান্নাকাটি করলাম, কিছুতেই ছাড়লে না। হাজতে নিয়ে গেল। সে কি মার ! সে কি কষ্ট ! জানিস্ হারানী !—তবু প্রাণ থাক্‌তে আমি বাবুর নামও প্রকাশ করলাম না ; কোথায় তখন থাক্‌তেন তাও বললাম না—এই বলিয়া চরণ একটু থামিল। পরে হাতখানা হারানীকে দেখাইয়া বলিল,—এই দেখ্‌ কব্জিখানা মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছিলো একজন—সেদিন না বলছিলি, চরণদার হাতে একটুও জোর নেই, গদীখানা নামাতে কত রকমই না করচে—ওরে, সত্যই হাতখানা আমার সেই অবধি গেছে।—এঁ্যা—ওকি হলো, জাঁতিতে যে হাতটা গেল কেটে, দে রে একটু তুলো দিয়ে বেঁধে দে—নীচু থেকে একটু জল আনবো ?

হারানী মুচকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—না থাক, জল আনতে হবে না—তোমার হাতটা ভেঙ্গে গেল, তা'তে তোমার কষ্ট হলো না ; আমার এতটুকু কেটে গেছে তাতেই কি ম'রে যাব ? ও কিছু না, তুমি ব'লে যাও, তারপর কি হলো—একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম কি না—বলিয়া হারানী অঙ্গুলিটীর রক্ত মুছিয়া তুলো দিয়া টিপিয়া ধরিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহার দিকে চাহিল।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চরণ বলিতে লাগিল—তারপর আর কি শুন্‌বি হারানী ; এত কষ্ট ক'রেও তাঁকে রক্ষে করতে পারলাম

না। তার তিন মাস পরে একদিন রাত্রে আমায় ত ছেড়ে দিলে, আমার পূর্ব্বেই শেখানো ছিলো, পুলিশে ধরলে কি বলতে হবে—আমি তেমনটি ব'লে ত রেহাই পেলাম। কিন্তু আসবার সময় দারোগা সাহেবকে ব'লে আসতে হ'লো যে, বাবু এলেই আমায় থানায় লুকিয়ে সংবাদ দিতে হবে—আরও কত টাকা দেবে বল্লেন—জানলি হারানী, তারা ভেবেছিলো আমি চাকর, গরীব, বোধ হয় টাকার লোভে ধরিয়ে দেব! মনিব আমায় টাকার ঢের উপরে। আমি কোন রকমে তাদের কথায় সায় দিয়ে উদ্ধার পেলাম। তারপর অনেক দিন বাদে একদিন রাত্রে বাবু আমার -ঐ বাহিরের যে কুঁড়ে ঘর দেখচিস্—ঐখানে এসে হাজির। বাবুকে দেখে আমি ত কেঁদে ফেললাম, বাবুও কেঁদে ফেললেন। তারপর বাবু বল্লেন—দেখ্ চরণ, তুই আমার চাকর নয়, তুই আমার বন্ধু, তোর হাতে আজ আমার—আমার লতি আর বিশ্বনাথ রইলো—বোধ হয় শিগ্গিরই ধরা পড়্বো—তখন দুটোকে দেখিস্ যতদিন না ফিরি।—আমি বললাম, আমি তোমায় লুকিয়ে রাখবো। তাতে তিনি বল্লেন—ওরে আর তোকে কষ্ট দেব না, যে কষ্ট তুই আমার জন্যে পেয়েছিস্—আর না।—আমি একবার ছেলে-মেয়েটার সঙ্গে, মার সঙ্গে দেখা করতে বললাম, ভাবলাম, যদি শেষের দেখার সময় মায়া হয়,—তাতেও তাঁর সময় হলো না। তখনি তিনি চলে গেলেন। যেন আমায় ভার দিতে এসেছিলেন—এমনই ছিল তাঁর দেশের কাজ। তারপর দু'এক দিন বাদেই সংবাদ পেলাম, তিনি ধরা পড়েছেন। তারপর জেল!:

চরণ এখানে থামিল। কণ্ঠে তাহার অশ্রু ভরিয়া উঠিয়াছিল, কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না; হারানীও অভিভূতের মত চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ এমনভাবে কাটিলে চরণ বলিল,—হারানী আমি তা'কে মনিব বলি তোদের সাম্নে—তিনি যে আমার কে ছিলেন আর আমি

যে তাঁ'র কি ছিলাম, তা মা কালীই জানেন। আবার সে চুপ করিল। হারানী দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া সুপারির বাটিটা হাতে করিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল—আমাদের ঝি-চাকরের বরাতে কি আর কখনও সুখ আছে চরণ-দা? তুলোগুলি সযত্নে কুড়াইতে কুড়াইতে চরণ বলিল,—সে কথা আমি আর এ মুখে বল্‌তে পারি না। চাকরীর প্রথম দশটা বছর আমার যে কি সুখেই গেছে—তা আমি আজও ভাবি, আবার যখন তাঁর গচ্ছিত ধন তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেব, তখনও আমার কম সুখ হবে না হারানী! ভয় কি, সে সুখ তোর কপালেও আছে বলছি।

তারপর মনিবের সম্বন্ধে আরো দু'চারটে কথার পর তাহারা যে যার কাজে চলিয়া গেল। এমনি কথায় কাজে সহানুভূতিতে দুজনেই দু'জনার অজ্ঞাতসারে পরস্পরের মন হরণ করিয়া যাইতে লাগিল।

সাধুর মাষ্টার চলিয়া গেলেন। বিশু নিজের পুস্তক-খাতা-পত্রাদি গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িল; সাধু তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য বসিতে বলিল, বিশু মিনতির সুরে কহিল,—আজ আর এখন বোস্‌বো না ভাই! বাড়ীতে একটু দরকার আছে।

সাধু হাসিতে হাসিতে বলিল,—দরকার ত রোজই থাকে বিশু, আজ না হয়—

—না ভাই আজ আমায় মাপ কর।

সাধু বেশ জানিত, বিশুর বাড়ীতে দরকারের মধ্যে হয় দোকানে যাওয়া, নয় বাড়ীর ফাইফরমাস্ খাটা এই বৈত আর নতুন কিছু নয়! তাই সে বলিল,—দরকার হবে এখন,—আজ একটা তোকে সুখবর, দেব, তাই বসিয়ে রাখ্‌চি।

বিশু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল,—আমার আবার সুখবর, আমার সুখবর হ'বে-তবে, যবে জানবে যম এসেছে আমায় নিমন্ত্রণ করতে, নয় ত পাড়ার ছেলে বুড়োরা আমায় একঘরে করেছে!

সাধু ওসব কথায় কোন কাণ না দিয়া বলিল,—না ঠাট্টা নয়, বিশু, আজ বাবা মতিবাবুর ওখানে গেছেন, তোমার বাবার সংবাদ আনতে, তাই তিনি আমাকে বসিয়ে রাখতে বলেছেন।

বিশুর মন ভিতরে ভিতরে এক অপূর্ব্ব আনন্দে নাচিয়া উঠিল। বহুদিন সে পিতার আদর হইতে বঞ্চিত। কবে সে দশ বৎসরের সময় আদর পাইয়াছে! তারপর এই কয়েক বৎসর তাহার অন্ধকারের মধ্যে কাটিয়া গিয়াছে। সংবাদ সে যে পায় নাই তাহা নয়; কিন্তু সে যে না-পাওয়ারই মধ্যে, কিন্তু আজ তাহার সে বয়স নাই, কিছু কিছু বুঝিবার ক্ষমতাও তাহার বাড়িয়াছে,—এ সংবাদের আগ্রহও তার বাড়িয়াছে। তাই সে আকুল আগ্রহের সহিত সাধুকে জিজ্ঞাসা করিল,—কাকাবাবু কখন আসবেন?

সাধু বন্ধুর আগ্রহে পুলকিত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—বেশী দেরী হ'বে না—এই বাবা এলেন ব'লে। আমায় বলে গেছেন তোমায় বসিয়ে রাখতে।—না হয় আজ এখান হ'তে খেয়ে যেও না!

—না না সে বড় দেরী হয়ে যাবে।—কাকাবাবু সত্যি।—

সাধু একটু অভিমানের সঙ্গে বলিল,—আমার কথা বিশ্বাস হয় না, এসব কথা নিয়ে আমি কি কোন দিন তোর সঙ্গে ঠাট্টা করেছি?

সঙ্গে সঙ্গে বিশুর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। বলিল,—সাধু, আমি তোকে প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমার ভাগ্যে এ সৌভাগ্য যে বিশ্বাস করা দায় হয়ে দাঁড়ায় ভাই,—পাছে আবার সে দিনকার মত শুনতে পাই—যে খবর এলো না।

এ শঙ্কা যে সাধুরও ছিল না তাহা নহে ; তথাপি সে বলিল,—একটু বোস না ভাই—দু'জনে একটু গল্প-গুজব করা যাক্ ; তা' হলেই সময় দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে যাবে'খন।

তাহার ত ষোল আনা ইচ্ছা বসিয়া থাকিবার ! সে পিতার সংবাদের জন্য অনাহারে অনিদ্রায় কতই না দিনরাত কাটাইত। কিন্তু আজ যে সেজকাকার জুতাটা পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে, আজ যে তাঁর নিমন্ত্রণ ! এখানে পড়িতে আসার পূর্ব্বেই যে তিনি বলিয়া দিয়াছেন ! এ দুঃখ, এ চিন্তা, ইহার ব্যথা যে তাহার প্রাণে আজ বাজিয়া উঠিল না তাহা নহে, কিন্তু পিতার সংবাদ আসিবার অপেক্ষায় এসব কোথায় ভাসিয়া গেল। হাজার অনিচ্ছা তাহার ঐ এক ইচ্ছার কাছে পরাভূত হইয়া গেল ! সে বসিয়া রহিল। দ্বার-প্রান্তে সামান্য কোন একজন-কার পদধ্বনি শুনিবার জন্য তাহার সমস্ত মন সজাগ হইয়া রহিল। সাধু এ-কথায় সে-কথায়—তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিল ! কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না ! সে দূরের পথটার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়াই রহিল।

বেলা বাড়িতে থাকিল। দূরে কাহাকে দেখা গেল না। বিশুর প্রাণ আশঙ্কায় আবেগে উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া উঠিল। কিন্তু সে তাহার পিতার সংবাদ না লইয়া যাইতেও পারিল না। কিছুক্ষণ পরে যে সত্য সত্যই চঞ্চল হইয়া উঠিল,—উঠিয়া জানালার দিকে মুখ বাড়াইয়া কাহাকে যেন খুঁজিবার জন্য চেষ্টা করিল। তারপর হঠাৎ দৌড়িয়া পথের বাহির হইয়া পড়িল। সাধু বাধা দিবার অবসর পর্য্যন্তও পাইল না, সেও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কক্ষ ত্যাগ করিল। বিশু দৌড়িয়া পথের মাঝে অনন্তবাবুকে ধরিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি খবর কাকাবাবু ?—

অনন্ত বাবু তাহার আগ্রহ দেখিয়া ব্যথিত স্বরে কহিলেন,—খবর আজ পাওয়া গেল না, কাল বোধ হয়—

বিশুর আর শুনিবার ধৈর্য্য রহিল না—সে কথার মাঝে গলা-ভাঙ্গা স্বরে কহিল—আচ্ছা কাকাবাবু!—

তারপর সেথায় ক্ষণকাল অপেক্ষা না করিয়া বাড়ীর পথ ধরিয়া বহু-দূরে চলিয়া গেল। পিতাপুত্রে নীরবে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের দিকে সে একবারও ফিরিয়া চাহিল না।

শ্রান্ত মন প্রাণ, ক্লান্ত দেহ লইয়া যখন সে বাড়ী গিয়া পৌছিল, তখন বেলা প্রায় বারটা হইবে। বাড়ী ঢুকিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া—বরাবর উপরে সেজকাকা-বাবুর ঘরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কর্ত্তব্য-পালনের জন্য সেজবাবুর পাদুকাদ্বয় হাতে করিল। সেজবাবু তখন সাজগোজ সম্পন্ন করিয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে কক্ষ হইতে বাহির হইতেছিলেন। সম্মুখে বিশুকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, রেখে দে জুতো—বাবুর এখন সময় হলো!

বিশু ম্লানমুখে বলিল,—এখুনি হ'য়ে যাবে, কাকাবাবু!

—ফের মুখের উপর কথা—রেখে দে বল্‌চি,—আমরা যেন কে চাকর আমাদের কথা কি শোনবার উপযুক্ত যে বাবুর হুঁস থাকবে?

এসব কথায় কাণ না দিয়া বিশু মন দিয়া কাজ করিবার উপক্রম করিল। কি জানি কেন সুরেনের ক্রোধ বোমার মত ফাটিয়া গেল; সে তাহার হাত হইতে একপাটি কালি-মাখান জুতা লইয়া সজোরে তাহার পিঠে বসাইয়া দিয়া বলিলেন,—আমার কথায় গ্রাহ্য নেই—আমি বাড়ীর কে—কে! বলিয়া আরো কয়েক ঘা দিল। প্রথম আঘাতেই সে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল এবং "ওঃ—" বলিয়া কেবল একবার করুণস্বরে

চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর মুখ নত করিয়া হাত দিয়া আঘাত রোধ করিবার চেষ্টা করিল।

নিমেষে ছেলে-মেয়ে, বৌ-ঝি সেই ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। হারানী দৌড়িয়া গিয়া দুইজনের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; এবং ব্যাকুলকণ্ঠে বিশুকে বলিল,—সরে যাও দাদাবাবু এখান থেকে, শিগ্‌গীর সরে যাও! তারপর সেজবাবুকে মিনতি জানাইয়া কহিল,—আর মের' না দাদাবাবু, তোমার পায়ে ধরি—'ব্যাগ্যত্তা' করি। অত বড় ছেলের গায়ে হাত কি সেজবাবু?

সেজবাবু প্রহার থামাইয়া বলিল,—আজ তোমায় আস্ত রাখ্‌তাম না! ছেলের যত বড় মুখ তত বড় কথা—কথা গ্রাহ্য নেই,—পড়তে গিয়ে সারা দুপুর আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে আসা। যত কিছু না বলি ব'লে মাথায় উঠেছে।

বিশু সজল নয়নে কঠোরভাবে মাটির দিকে চাহিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া এসব শুনিল, সহ্যও করিল। হারানী তাহাকে ধরিয়া নীচেয় লইয়া গেল। নীচেয় লইয়া গিয়া হারানী বলিল,—দাদাবাবু এখানে একটু বসুন, আমি এক বাল্‌তি পাত্‌কো'র ভাল জল এনে দিচ্ছি। মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিন। হাতটা দিয়ে রক্ত বেরুচ্চে, না?

বিশু একবার চাকরাণী হারানীর দিকে তাকাইল। সে দৃষ্টি কি অপূর্ব্ব! সে এতক্ষণে নিজের ক্রোধ এবং দুঃখটা সাম্‌লাইয়া লইল, বলিল,—কিছু কর্‌তে হবে না হারানী—আমি পুকুর থেকে ধুয়ে আস্‌চি—রক্তর জন্যে ভাবতে হবে না—বোধ হয় জুতোর পেরেক লেগে কেটে গেছে।

হারানী আর তাহাকে বাধা দিয়া বিরক্ত করিতে চাহিল না—কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বলিল,—আচ্ছা, তাই এস, আমি ভাত

বাড়তে বলি গিয়ে। বেশী দেরি করো না যেন—শিগ্‌গীর এস, মশাইয়ের একরকম খাওয়া হয়ে গেছে।

বিশু একবার প্রশ্ন করিল—চরণদা কোথায়?

হারানী বলিল,—সে গরুর ভূষি কিনতে বাজারে গেছে।

—দেখ হারানী, একথা যেন তুমি চরণদাকে বল'না। বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুইটী ছল ছল করিয়া আসিল। সে কাঁদিয়া ফেলিবার আগই কক্ষের বাহির হইয়া গেল।

হারানী বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই আসে—এই আসে করিয়া বহুক্ষণ কাটিল। চরণ ভূষি লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় দ্বারে হারানীকে দেখিয়া বলিল,—এখানে দাঁড়িয়ে?

হারানী অন্যমনস্কভাবে বলিল,—এই এম্‌নি।

চরণ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে সেজ-মার ডাকে হারানীকে ভিতরে আসিতে হইল। ভিতরে আসিয়া সেজ-মার কার্য্য করিতে থাকিল; কিন্তু মন তাহার পড়িয়া রহিল—বিশুর ভাবনায়। সেজ-মা খাইতে বসিয়াছে—আজিকার সব কথা হইতে হারানী বলিল,—কিন্তু যাই বল সেজ-মা, সেজবাবুর ভারি অন্যায়—অত বড় ছেলের গায়ে হাত দেওয়া—জুতো—মারা!

সেজ-বৌ সহজভাবেই বলিল,—দোষ করলেই মারতে হয়।

হারানী সামান্য আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—তা বলে সমস্ত ছেলেকে জুতোর বাড়ি মারা—আহা ছেলেটা একটাও জবাব দিলে না—এই ত বেলা এতটা পড়ে গেল, কে তার খোঁজ নেয়?

সেজ-বৌ তিক্তস্বরে কহিল,—তোর যদি দয়া উৎলে থাকে ত যা না খোঁজ নিতে।

হারানীর এ কথায় রাগ হইয়া গেল। বলিল,—তার নিজের কাকী-মারা রইলো—আমরা ঝি হ'য়ে তাঁর খোঁজ নিতে যাবো—লোকে বলবে কি ?

রাগে সেজ-বৌ বলিল,—তবে চুপ করে থাক, ঝি আছ, ঝিয়ের মত থাক,—মনিবের কথায়—কাজের ব্যাখ্যা করে না।

—না, বল্‌তাম না—এতদিন বলিওনি—তবে এত বড়ো অন্যায়টা সহ্য করতে পারছি না তাই বলা। তোমারও ত সেজ-মা, নিজের ছেলে-পিলে আছে, কেউ যদি অমন করে ?

সেজ-বৌ কোন অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায় বলিল,—আ মর্—চুপ কর্ মাগি, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা—আমার ছেলেকে শাপ-মন্নি দেওয়া—ঝেটিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব না,—বেরিয়ে যা' আমার বাড়ী থেকে এখনি !

হারানী অবাক্ হইয়া বলিল,—দেখলে মেজ-মা, শুনলে ত, আমি কি এমন কথা বলেছি যে যার জন্যে—

এমন সময় চরণ সেথা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল,—হারানী তখন আমায় বলিস্‌নি, এমন কাণ্ড হয়েছিলো, এখন যদি আমার বিশুকে না পাই ; যদি জলে ডুবে থাকে ! হাঁরে, হারানী, তোদের বাড়ীর ভেতর কেউ নেই. কেউ ছিল না তখন যে তাকে ধ'রে রাখে ? আমি কেন মরতে ভুষি কিনতে গেলাম আজ, বাবারে আমার ! বলিতে বলিতে বৃদ্ধ চরণ সেথায় দাঁড়াইয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তিনটি নারীর প্রাণই একসঙ্গে ভিতরে সজোরে ধড়াস্ করিরা উঠিল। আশঙ্কায় তিন জনারই মুখ মুহূর্ত্তে ম্লান বিবর্ণ হইয়া গেল। সেজ-বৌ, মেজ-বৌয়ের হাতের ভাত হাতেই রহিয়া গেল ; হারানী

নিশ্চল নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল চরণের কান্না ছাড়া আর কাহারো মুখে দ্বিতীয় শব্দ বাহির হইল না।

ক্ষণকাল নীরবে কাটিল। তারপর হারাণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—চরণদা', একবার শুঁড়ী-পুকুরটা দেখে এস, সে স্নান করে আস্‌চি বলে অনেকক্ষণ চলে গেছে—যাও দুঃখ কর'খন পরে। বলিতে বলিতে চরণকে লইয়া সেও বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

পরিত্যক্ত দুইজন নারীর দুধ-গুড়মাখা ভাত নিমেষে তিক্ত-বিষাদ হইয়া গেল। একটা দুর্ভাবনা, একটা অপরিচিত নির্ম্মম আশঙ্কায় তাহাদের হৃদয় উদ্দাম হইয়া উঠিল। আর তাহাদের আহারের তৃপ্তি আসিল না—তাহারা উঠিয়া পড়িল।

বারন্দায় ও-পাশের ঘরে মা রোগ-শয্যায় শুইয়াছিলেন—লতি তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হয়েছে রে লতি, চরণ কাঁদচে কেন?

লতি অল্প ভাবিয়া বলিল,—ও কিছু না—ঠাকু'-মা, কি জানি কি হয়েছে, তোমার ও-সব ভাববার কি দরকার—ডাক্তার বলেছেন ঘুমোও একটু! বলিয়া সে তাহার চক্ষু দুইটী মুছিয়া ফেলিল।

—তুই আজকাল অনেক কথা যেন আমায় লুকোস্—এরি মধ্যে পাকা গিন্নী হয়ে উঠলি যে? আচ্ছা—আমি ঘুমুচ্ছি। কিন্তু আমি বেশ শুন্‌তে পেয়েছি কে যেন কাকে মার্‌লে—পোড়া ঘুমও মর্‌তে সেই সময় চোখ জড়িয়ে এসেছিলো। লতি, আজ বিশু যে এখনও এলো না একবার।

লতিকা বলিল,—কি জানি, বোধ হয় কোনও কাজে গেছে।

দুঃখের পীড়নে সত্যই লতি এতটুক্ বয়সেই অনেক বুঝিয়া ফেলিয়াছিল। অনেক সহ্য করিতেও শিখিয়াছিল।

এ-পুকুর, সে-পুকুর, এ-বাগান, সে-বাগান খুঁজিয়া একে-তাকে

জিজ্ঞাসা করিয়াও চরণ বিশুর কোন খোঁজ পাইল না। সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—হারানী, তুই এ-ধারে খোঁজ্ দে, আমি একবার অনন্তবাবুর বাড়ী খোঁজ নিয়ে আসি। বলিয়া সে সেই কাঠ-ফাটা রৌদ্রের মধ্যে মাথায় গামছা দিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিল।

যতক্ষণ তাহাকে দেখা যায়—হারানী সেদিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর নিজেই আপন মনে বলিল,—আহা, বাছাকে পুকুরে না যেতে দিলেই হতো! জগতে মা নেই যার—কেউ নেই তার। তারপর দূরে—বহুদূরে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বলিল,—মা, অনেক পাপ করেছি—যদি ভুলেও একদিন পুণ্যি করে থাকি ত তার বলে আজ ছেলেটাকে ফিরিয়ে দাও মা। না হ'লে চরণও মরবে, বুড়ি-মাও বাঁচবে না। আর আমার প্রাণে বড় ব্যথা বেজে থাকবে মা, আমিই তাকে ছেড়ে দিয়েছি।—বলিতে বলিতে সেখানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ কাঁদিল—তারপর বাড়ীর দিকে ফিরিল।

চরণ তার স্থবির দেহখানা নিয়ে, যত দূর পারিল জোরে হাঁটিতে লাগিল। ক্লান্ত পা'দুখানা টানিয়া টানিয়া যখন সে সাধুদের বাড়ীর সম্মুখে আসিল, তখন বেলা তৃতীয় প্রহর। বাহিরের ঘরের দরজা দেওয়া। হতাশায় বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। পরক্ষণেই ভাবিল, ভিতরে হয় ত থাকিতে পারে। বাড়ীর দরজার কাছে তাই ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক দিল,—সাধু-দা! সাধু-দা! বিশু আছে এখানে? অনন্ত বাবুর স্ত্রী চরণের গলা চিনিতেন—ভিতর হইতে কহিলেন,—কে, চরণ না কি? কি হয়েছে, এমন অসময়ে যে! বলিতে বলিতে বোধ হয় কোন বিপদের আশঙ্কা করিয়াই তাড়াতাড়ি দ্বার উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন।

চরণ শঙ্কাব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—বিশু এখানে নেই? সাধুর মা বিস্ময়ে উত্তর দিলেন—না, সে ত এখান থেকে এগারটার সময় চ'লে

গেছে—আর ত আসেনি—কেন কি হয়েছে?—বলিয়া আরও বিস্মিত নেত্রে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। কি হয়েছে মা—আমার কপাল ভেঙেচে! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিয়া যাইতে লাগিল।

সাধুর মা একমনে সব শুনিয়া গেলেন। তারপর তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—কোন ভয় নেই চরণ, আমি বল্‌চি, সে অমন পাপ কাজ করবে না। তুমি পুরুষ, তুমি অমন হাউ হাউ করে কাঁদ্‌লে চলবে কেন? উপরে সাধু ঘুমুচ্চে—ডেকে দিচ্ছি। সে এখনি খুঁজে দেবে'খন—ভয় কি চরণ?

তিনি তৎক্ষণাৎ সাধুকে ডাকিয়া দিলেন এবং সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে চরণের সঙ্গে যাইতে বলিলেন। চরণ আর সাধু বিশুর খোঁজে বাহির হইয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে সাধু জিজ্ঞাসা করিল—চরণ-দা, হারু, তিনু, হরিপদ-দার দোকান—ওসব খুঁজেছি, সব খুঁজেছি। তা'কে কি আর পাবরে দাদা!

সাধু সান্ত্বনার স্বরে কহিল,—তুমি ক্ষেপেছ চরণদা, কোথাও যদি তাকে না মেলে ত দেখবে শ্মশান-ধারে—গঙ্গার ধারে যে বড় ভাঙ্গা ভড়টা পড়ে আছে—তার ধারে সে ব'সে থাকবেই। আমি জানি, তার কোন কিছু দুঃখ কষ্ট হ'লেই কিংবা মন খারাপ হ'লেই সে ঐখানটিতে ব'সে চুপ করে শ্মশানের ধারে চেয়ে থাকে!

চরণ একটু যেন আশার আলোক পাইয়া বলিয়া উঠিল,—তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, আমি তোমার চিরকালের কেনা গোলাম হ'য়ে থাক্‌বো।

এ কথায় সাধু হাসিল। কারণ সে জানিত যে, চরণ আর যাহাই

বলুক, সত্য হইতে পারে, কিন্তু সে বিশুদের ছাড়া আর কাহারও গোলাম হইতে পারিবে না। অতএব এ তাহার মিথ্যা কথা।

সাধু ছোট বেলা হইতেই বিশুকে খুব ভালবাসিত। দু'জনই দু'জনকে বাল্যকাল হইতেই মন-প্রাণ তাহাদের নিজেদের অজ্ঞাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের প্রাণের এত ভাব স্বত্বেও তাহাদের মধ্যে বাহিরের দিকের মস্ত বড় একটা ব্যবধান ছিল। সেটা হইতেছে এই যে, সাধু ছিল বুদ্ধিমান্ বিদ্যানুরাগী, আর বিশু ছিল একটু গোঁয়ার একগুঁয়ে। সাধু ছিল স্থির আর বিশু ছিল সাহসী, নির্ভীক ও চঞ্চল। কিন্তু তথাপি দুইজনেই দুইজনকার প্রাণের ব্যথা প্রাণের কথা বুঝিতে পারিত, কেথোয়ও বাধিত না। সাধু বরাবর সুখের কোলে মানুষ হইয়া বড় হইয়াছে, আর বিশু দুঃখের কোলে মানুষ হইয়াছে।

প্রথম প্রথম পুলিশের ধর-পাকড়ে যখন সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া এই নিভৃত একটি ছোট পল্লীগ্রামটিতে বাস করিতেছিল, তখন এই সাধু আর তাহার পিতা ছাড়া আর বড় কেহ একটা বিশুদের সহিত সদ্ভাব রাখে এমন একটু সাহস কাহারও ছিল না। তখন সাধুই বিশুর এক-মাত্র সহচর ও সঙ্গী হইয়া কাল কাটাইতেছিল। ঐ একটি পরিবারই তাহাদের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদাররূপেই এ গ্রামে ছিল। তারপর এখন বিশুদের পয়সাও হইয়াছে, আর পুলিশের ভয়ও অনেকটা কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে; তাই আবার অনেক পরিবারের সদ্ভাবও হইয়াছে। তথাপি বিশু সাধুকে যেমন এইটুকু বয়সেই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, তেমন আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই।

যাহা হউক, চরণকে সঙ্গে করিয়া সাধু যখন শ্মশানের পথের দিকে রওনা হইল, তখন তাহার বুকটাও কেন-জানি একটা অজানিত ভয়ে বার কয়েক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে চলিতে চলিতে একবার

চরণের মুখের চোখের দিকে তাকাইয়া লইল। তারপর একটা কান্না তাহার বুকের মধ্য হইতে ঠেলিয়া উঠিয়া চক্ষু দিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল। তবুও সে প্রাণপণ যত্নে তাহার মনের ভাব চরণের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিল।

চরণের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে সামনের পথটার দিকে এক-দৃষ্টে লক্ষ্য করিয়া প্রাণপণে চলিয়াছে। সত্যই ত ঐ ভড়ের ছায়ার তলে কে না বসিয়া আছে! ঐ ত—ও আর কেহ নয়, ও নিশ্চয়ই আমাদের বিশু! ঐ ত তার মোটা কালো খদ্দরের কাপড়টা গায়ে জড়ান! চরণ আর থাকিতে পারিল না, দূর হইতেই চীৎকার করিয়া ডাকিবার চেষ্টা করিতেই সাধু তাহার মুখটী তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ হস্তে চাপিয়া ধরিল এবং শঙ্কাকুল স্বরে বলিল,—কর কি চরণ দা, আমাদের দেখতে পেলেই হয়তো পালিয়ে যাবে, নয়ত—

চরণ অপরাধীর মতই বলিল,—ঠিক বলেছে দাদা, ঠিক বলেছে—এখনও ত রাগ আছে বিশুর।

—দেখ, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি পিছন থেকে চুপে চুপে গিয়ে ধরি, তারপর তুমি বাড়ী নিয়ে যাও,—কেমন? কিন্তু চেঁচিও না—তা'-হলে কিন্তু আমার দোষ নেই।

চরণ চোখের অশ্রু মুছিতে মুছিতে হাসিয়া বলিল,—হাঁ দাদা, ঠিক বলেছ, আমি মুখ্যু মানুষ—এখুনি আর এক ফেঁসাদ বাঁধিয়ে ছিলাম আর কি! তাকে ধ'রে বলো, চরণদা তোর ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

তার পর চরণ কিছুদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। সাধু ধীরে ধীরে তথায় গিয়া পিছন হইতে যেন রহস্যভরেই তা'র চোখ দুটি টিপিয়া ধরিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—এঁ্যা, ব'সে ব'সে বুঝি হেথা কান্না হ'চ্ছে!

বিশু তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল,—বোস্ মা একটু এখানে —আমি যে এখানে, তোকে কে খবর দিলে রে ?

সাধু তাচ্ছিল্যভরে বলিল,—কে আবার বলবে !—এস আর হেথা ব'সে থেকো না—আমাদের বাড়ী চলো। বেলা পড়ে গেল—স্নান আহার করবে এসো !

বিশু একবার আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইল ; তারপর এ-ধারে চোখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইল চরণ তাহার সম্মুখে ! চরণ আর সেথা দাঁড়াইতে পারে নাই, তাই সেথা চলিয়া আসিয়াছে। চরণ আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

অনেক সাধাসাধির পর—অনেক সুখ-দুঃখের কথার পর— অনেক কষ্টে চরণেতে সাধুতে তাহাকে সাধুর বাড়ীতে লইয়া যাইবার অনুমতি পাইল। চয়ণ বাড়ীতে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল। সাধু তাহাকে লইয়া বাড়ী ফিরিল।

তারপর সন্ধ্যা হইয়া গেল। মা সাধুকে ও তাহাকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া অনেক উপদেশ দিলেম, অনেক স্নেহবাক্য, বহু সান্ত্বনার কথা বলিলেন। তারপর বলিলেন,—মান-অভিমান কার উপর করিস্ বিশু ! এখন বয়স হ'য়েছে—কিছু কিছু বুঝতেও শিখেছ—আর এই কটা বছর ত দেখতে দেখতে কেটে যাবে, যখন আট বছর কাটলো, আর এই কটা বছরও কেটে যাবে, বাবা ! ঐ ক'টা দিন যা'হোক ক'রে কাটিয়ে দাও, তারপর তোমায় দেখে কে ! চিরকাল ভগবান কাউকে আর একটানা দুঃখ দেন না। তারপর চরণ আছে, ঠাকুর-মা রয়েছেন, তাদের দেখাশুনো ক'র।—আহা ! চরণ আমার কাছে রোজ খোঁজ নেয়, বলে,—বড়-মা বাবুর আর ক'দিন দেরী আছে আসতে ?—

আচ্ছা বড়-মা, এমনও ত হ'তে পারে তাদের যদি দিন গুণতে ভুল হয়, খুব ক'সে কেঁদে কেটে ধরলে কি ছেড়ে দেয় না ?

এমন কত পুরাতন কথা হইল। দুই বন্ধুতে মিলিয়া শুনিল, কেহ একটিও কথা কহিল না।

এইসব কথার মাঝেই অনন্তবাবু বাড়ীতে ঢুকিলেন; বাহিরের ঘরে এমন সময় বিশুকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে বিশু আছে, ভালই হয়েছে। তোমার পিতার সংবাদ পেয়েছি। তিনি ভাল আছেন, তোমাদের সকলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করে নিয়েছেন।

তারপর স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আর আমাকে কি বলেছে জান— লতির আর চরণের সংবাদ রাখতে।—বলিয়া একটু হাসিলেন। একবার তাহার পিতৃবিরহ-কাতর পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া দেখি-লেন, পরে তিনি কাপড় জামা ছাড়িতে উপরে উঠিয়া গেলেন। সাধু ও বিশু বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

এদিকে চরণের ফিরিয়া না-আসা পর্য্যন্ত হারানী দোর পথ করি-য়াছে। লতি এক একবার বাহিরে আসিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইয়াছে, তাহাকেই দাদার কথা কিংবা চরণদার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে। সেজ-বৌ মেজ-বৌও ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন বটে, কিন্তু কাণটা পড়িয়া আছে দ্বারের দিকে। এমনি ভাবে অনেকক্ষণ কাটিল, তবুও চরণের দেখা নাই। কি যে সে অমন সব কথা কহিল তাহা সেই জানে! ঠাকুর-মা এই কতক্ষণ বিশুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। লতি ছুটি পাইয়া বাহিরে আসিয়া হারানীকে বলিল,— চরণ-দা এখনও কেন ফিরলো না বলতো ?

হারানী চিন্তাকুল মুখে কহিল,—তাই ত আমি ভাবচি। আমারই আহাম্মকিতে এমন হয়েছে দিদিমণি, আহা! তাকে যদি না সেই সময়

ছেড়ে দি তা হলে আর এত ভাবতে হয় না। পোড়া কপালে যে কি আছে কে জানে?

দূরে চরণকে দেখা গেল। আগ্রহে লতি বলিয়া উঠিল,—ঐ চরণ-দা আস্‌চে ত!

হারানী সে দিকে চাহিয়া বলিল,—কই সঙ্গে ত বিশু নেই। কিন্তু তাহার আর কোনরূপ কুচিন্তা আসিবার পূর্ব্বেই ভাল করিয়া চরণের প্রসন্ন মুখটা দেখা গেল। চরণ নিকটে আসিতে হারানী, লতি সকল সংবাদ লইল। হারানী বলিল,—কালী-বাড়ীতে আগে গিয়ে পূজো দিয়ে আসি, তারপর অন্য কথা—বলিয়া সে চলিয়া গেল। লতি ঠাকুর-মার কাছে গেল।

ঠাকুর-মার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কনক তাহার পাশে বসিয়া আছে। লতি নিকটে যাইতেই ঠাকুর-মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—চরণ এসেছে?

—হাঁ এসেছে।—বলিয়া বিরক্তমুখে একবার সে কনকের দিকে চাহিল।

কনক অপরাধীর মত মুখ নত করিয়া লইল।

—বিশু কোথায়?

—দাদা সাধুদের বাড়ীতে আছে।

এতক্ষণ পরে একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন,—হ্যাঁরে লতি, তুই আজকাল বড় গিন্নী হয়েছিস্—না?—তুইও সব কথা লুকোতে আরম্ভ করেছিস। তোর ওপরও আমি আর কিছু ভরসা করতে পারবো না—তবে আর এবাড়ীতে বাঁচবো কার ভরসায়?

যদিও লতির দোষ ছিলো না, তথাপি লতি কাঁদিয়া ফেলিল – তখন আবার সেই বুড়ীকেই সান্ত্বনা করিতে হইল। তিনি স্নেহের স্বরে

বলিলেন, আমার উপর রাগ করিস্‌নি লতি—আমার অসুখ হ'য়ে আমি খিট্‌খিটে হ'য়ে গেছি!—ওরে আর আমার সাম্‌নে কাঁদিস্‌নি লক্ষীটি—আমি বুঝ্‌তে পেরেছি রে, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। তুই আমার ভালোর জন্যেই বলিস্‌নি।

তথাপি তাহার কান্না থামিল না,—আজ সমস্ত দিন ধরিয়া যে কান্না তাহার মনের ভিতর দানা বাঁধিয়া ছিল—এখন তাহা অঝোরে ঝরিয়া পড়িল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল, ঠাকুর-মা লতিকে কহিলেন,—কই এখনও যে বিশু এলো না দিদি ?

লতিও একবার এধার ওধার চাহিয়া বলিল,—চরণদা গেছে অনন্ত কাকাবাবুর বাড়ী।

—লণ্ঠনটা নিয়ে গেছে ত ?

লতি একটু হাসিয়া বলিল,—সে আর চরণ-দা'কে শিখিয়ে দিতে হবে না।

—তা বটে রে দিদি,—চরণই যে তোদের মা-বাপ রে।

তারপর চরণও আসিল, বিশুও আসিল। বিশু কাহারও সহিত বাড়ীতে সেদিন আর কোন কথা বলিল না, কেবল ঠাকুরমাকে কহিল,—ঠাক'মা, বাবার খবর পেলাম তিনি ভাল আছেন। তোমাদের সকলের খবরও তিনি পেয়েছেন।

তিনি একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—বেঁচে থাক বাছা আমার,—আদর আহ্লাদ পাও, এই আশীর্ব্বাদই করি। বলিয়া আর অন্য কোন কথা না বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িলেন।

চরণ আহার করিয়া বাহিরের ঘরের দেওয়ালে হেলান দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। এমন সময় তাহার বড়-একটা কাজ থাকে না

অধিকন্তু আজ সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। বসিয়া বসিয়া এটা-ওটা-সেটা ভাবিতেছে। এমন সময় হারানী তাহার কাছে আসিয়া বলিল,—চরণ-দা, একটু পেসাদ ধর! হাঁ কর, চন্নামেত্ত ঢেলেদি।

চরণ অত্যন্ত খুসি হইয়া মায়ের চরণামৃত পান করিল এবং তাহার হাত হইতে প্রসাদ লইবার সময় বলিল,—আচ্ছা হারানী! সত্যি তুই আমার বিশুর জন্যে মা-কালীর কাছে মানৎ করেছিলি?

চরণের মুখের ভঙ্গিমা দেখিয়া সে হাসিয়া ফেলিল বলিল—তা মানৎ করবো না? আমার জন্যেই ত এত কষ্ট সবাই পেলে; কি ভয় না আমার হ'য়েছিল! ও যদি ফিরে না আস্‌তো, তা হ'লে কি আমি বাঁচ্‌তাম চরণ-দা?

চরণ মনে মনে পুলকে অধীর হইয়া তাহার হাতটি ধরিয়া ফেলিল এবং দৃঢ়স্বরে বলিল,—তা আমি জানি হারানী—তুই তা'কে খুব ভাল-বাসিস্‌। আচ্ছা বল্‌তো, এমন ক'রে কখন কি কারুর জন্যে আজ পর্য্যন্ত তুই কালীমায়ের পূজো দিয়েছিস্?—আমার বিশ্বাস—না। ঠিক ক'রে বল্—বল্!

হারানী তাহার রকম দেখিয়া হাসিতে লাগিল। চরণ আরো ক্ষেপিয়া গেল, বলিল,—বল্, সত্যি করে বল্—আর কারুর জন্যে জীবনে এমন ক'রে মানৎ করেছিলি কি না?—হাতে কিন্তু মায়ের পেসাদ আছে, মিথ্যে বলবার যো নেই।

হারানী হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—ছেড়ে দাও—বলচি!

—হাত ছেড়ে দিলে তুই-একটা যা তা বল্‌বি।

সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না বল্‌বো না। আর একবার একজনের জন্যে এমন মানৎ করেছিলাম—সে অনেক দিনের কথা।

—ও আমি বিশ্বাস করি না,—আমাকে মজা দেখাবার জন্তে ও [illegible] তবে কা'র জন্তে বল্—ইস্ এমন আর প্রাণ ধ'রে মানৎ করতে হয় না।—হাতে পেসাদ যদি—

—সত্যি বলচি চরণ-দা, তোমার কাছে মিথ্যে বলবো না। হাতে পেসাদ রয়েছে—এখন ছেড়ে দাও—এসে বল্‌চি কা'র জন্তে।

—সত্যি ?

—সত্যি !

—বেশ এস, বুড়োকে ঠকালে হাতে কুট হবে—বলিয়া চরণ তাহাকে ভয় দেখাইল। সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

আজ হারানীর ব্যবহারে চরণের সত্যই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সে বিশুকে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসে। সে অন্তকে কোনদিন এত ভালবাসে নাই, এত ভালবাসিতে পারে না। তাহারই আনন্দে সে হারানীর সহিত আজ এমন ব্যবহার করিল।

অল্পক্ষণ পরে হারানী ফিরিয়া আসিয়া চরণের কাছে বসিল; হারানীর কথা শুনিবার জন্য চরণের তখন আর তত আগ্রহ ছিল না। কারণ হারানীর কথা যতটা সত্য হইবে চরণের প্রাণে, ততটা আঘাত লাগিবে।—এই আশঙ্কায় তাহার ততটা শুনিবার আগ্রহ আর রহিল না। কিন্তু অপর দিকে হারানী কালীর প্রসাদ হাতে করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—তাহার ত বলা চাই-ই। অতএব হারানীকেও বলিতে হইল এবং চরণেরও শুনিতে হইল। বলিবার পূর্ব্বে একবার হারানী কি ভাবিল, তারপর বলিল,—দেখ চরণদা, একদিন ভেবেছিলাম একথা বল্‌বো না, কিন্তু আজ হঠাৎ বলবার জন্তেই প্রতিজ্ঞা ক'রে বস্‌তে হলো। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই।

চরণ রাগিয়া বলিল,—দেখ্, হারানী, আর মনে মনে বানিয়ে

বল্‌তে হবে না—সত্যি বল্‌বি ত বল্‌! আমার ভারী ঘুম পাচ্ছে।

হারানী ভয়ে একবার চারিধার তাকাইয়া বলিল,—চরণ-দা, বানানর কথা নয়, সত্য একদিন এমন মানৎ করতেই হ'য়েছিল—বোধ হয় এর চেয়েও বেশী।

চরণ ধমক দিয়া বলিল,—মিথ্যে কথা।

এবার হঠাৎ হারানীর নয়ন দুটি ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। বলিল,—চরণদা, সত্যি তোমারও যদি সেদিন আস্‌তো, তুমি আমার চেয়েও বেশী প্রতিজ্ঞা করতে।

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, চোখের আর মুখের করুণ ভাব দেখিয়া চরণ আর কিছু তেমন বলিতে সাহস করিল না। বরঞ্চ, শুনিবার জন্য তাহার আগ্রহ দেখাইল। হারানী ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল—তখন আমার কাঁচা বয়স—এ চাকরাণীর ব্যবসা ধরিনি। একদিন আমার ঘরে হঠাৎ একজন ভদ্রলোক এলেন। বল্‌লেন,—আজ তোমার এখানে থাক্‌বো—কত দিতে হ'বে?—আমি হেসে বল্‌লাম—আপনি ত হাঁপাচ্ছেন, অনেক দূর থেকে এলেন বোধ হয়, একটু জিরুণ, তারপর না হয় কথা হ'বে! আশ্রয় নেবার জন্যে আমাদের ওখানে ছুটে এমনভাবে আস্‌তে তার পূর্ব্বে কারুখে দেখিনি। তাই প্রথমটা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছ্‌লাম। দু'চার দিন কেটে গেল। তিনি সকালবেলা চলে যান, আর আসেন রাত প্রায় আটটা ন'টায়। তেমন কোন কথাও কইতেন না, বিছানার একধারে পড়ে থাকতেন—আর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমার কোন অসুবিধা হ'চ্চে না ত? আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতাম। নতুন যা জিনিস চরণদা, তা খারাপ হ'লেও ভাল লাগে। আমারও তাই মজা লাগ্‌তো। আমার আশার অতিরিক্ত টাকা আমি পেতাম। সেদিক

দিয়ে আমার কোন আপত্তি আস্‌তো না। কেবল ভাবতাম, ইনি কি চান? আমাদের বাসায় আসা যাচ্ছে বুঝতে পার? নিজেদের অপরের চক্ষে হীন করা। তিনি নিজে নীচ নন, অথচ, লোকের মনে হীন হবার এত বাসনা কেন! ভেবে ভেবে একদিন মনে মনে ঠিক করলাম, আজ জিজ্ঞাসা করবো। করলাম জিজ্ঞাসা—আপনার কি কেউ নেই? হেসে তিনি উত্তর দিলেন—আছে। বাপ আছে, মা আছে, ভাই-বোন সব আছে।

চরণ কথার মাঝে বলিল,—তোকে বল্‌চি, কা'র জন্যে মানৎ করেছিলি তা নয়—ওঁর সঙ্গে কে কবে ফষ্টি-নষ্টি করেছিল—কে কবে করেনি, তারই গল্প। –দেখ্, চরণ বুড়ো হয়েছে বটে, কিন্তু সে অত বোকা নয়,—সব বোঝে, আজে-বাজে কথায় আমায় ভোলাতে পারবিনি। আসল কথা বল্! না হ'লে থাম্—আমি ঘুমাই।

হারানী হাসিয়া বলিল,—তাইত বল্‌চি।—বল্‌লেন সব আছে! আমি ত অবাক্! বল্‌লাম তবে এখানে থাকেন কেন?—উত্তর দিলেন, কেন তা' তুমি বুঝবে না। আমি হেসে বল্‌লাম—বুঝতে পারি না বলেই ত জিজ্ঞাসা করচি। তিনি হেসে মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বল্‌লেন,—কি ক'রে বুঝ্‌বে? বুঝ্‌তে শিখেছ টাকা—আর দেহ। জানি, এ ছাড়াও অনেক জিনিষ আছে—যাকে ভালবাসা যায়, তাকে আর এত ক'রে বুঝা যায় না।—এমনি তাঁর উত্তর! আবার একদিন বল্‌লেন,—সেদিন না আমায় বল্‌লে সব যে-কালে আছে—বাড়ী যাই না কেন? —তারা না গেলে ভারি কাঁদে বলে! আমি ত অবাক্!—তাঁ'র কথাগুলো চরণ-দা, সব উল্‌টো, কিছু বোঝবার যো নেই—অথচ চরণ-দা তুমি বললে বিশ্বাস করবে না—যত দিন যেতে লাগ্‌লো, ততই তার জন্যে কেমন-যেন-একটা মায়া জন্মে গেল। আমার

বাড়ীওয়ালীর একটা ছোট নাত্‌নী ছিলো—তাকে তিনি মাঝে মাঝে আদর করতেন, তা দেখে আমি একদিন তাঁকে বলেছিলাম, ছেলে-মেয়েদের উপর ত খুব দরদ—তবে এখানে প'ড়ে থাকেন কেন?—যান না বাড়ীতে ফিরে!—সে দিন হঠাৎ তিনি ব'লে ফেললেন,—ফেরবার উপায় নেই ভাই, ফেরবার উপায় নেই। তাদের কান্না ঘোচাবার জন্যেই তাদের কাঁদিয়ে এসেছি।

তখন চরণ হাসিয়া বলিল,—এমন উল্টোপাল্টা জবাব আমার বাবুও আমায় দিতেন; আমি যদিও বুঝতাম না, কিন্তু আমার ভালো লাগ্‌তো।

হারানী একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—একদিন একছড়া দামী নেক্‌লেস্ এনে বল্‌লেন—এই নাও, সময় এলে এর বদলে ঢের কাজ নেব। সত্যি বলচি, চরণ-দা, সেদিন থেকে গহনার উপর আমার বিরাগ হ'য়ে গেল। নিলাম বটে হাতে ক'রে অভ্যাস-বশে, কিন্তু তেমন তৃপ্তি পেলাম না।

চরণ বলিল,—কিন্তু কালী-মার কাছে মানৎ কি জন্যে করেছিলি, তা ত কই বলছিস্ না ত?

হারানী বলিল,—বলচি, একদিন মেঘলার সন্ধ্যে। বৃষ্টি পড়ি পড়ি করচে এমন সময় একটা লাল ব্যাগ হাতে ক'রে আমার ঘরে তিনি ঢুকলেন। ব্যাগটার উপর একটা সোণার জলের তীর আঁকা—

চরণ হঠাৎ অস্বাভাবিক স্বরে বলিয়া উঠিল—হারানী!

হারানী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চরণ জিজ্ঞাসা করিল,—তার উপর—

হারানী তাহার কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল,—তার উপর সাদা লেখা ছিল—"মুক্তিহারা"।

চরণ পরম আগ্রহে বলিল,—সাদা লেখা ছিল? তুই পড়েছিস্—পড়্‌তে জানিস্?

হারানী বলিল,—কেন কি হ'য়েছে, বল্‌না?

চরণ বলিল,—আগে তুই বল্, আমি বল্‌চি!

হারানী বলিতে লাগিল—তিনি সেটাকে রেখে আমার হাত দুটো ধ'রে বললেন—লক্ষ্মীটি! আমার একটা কথা রাখ্‌বে? এর পূর্ব্বে এত আদর—তাঁর কাছ থেকে পাইনি—আমি যেন কেমন হ'য়ে গেছলাম, চরণ-দা সত্যি বলচি, তুমি আমার বাপের বয়সী, তোমায় বলতে আমার লজ্জা নেই। আমি বল্‌লাম—কি কথা? তিনি বললেন আমায় বাঁচাতে হবে! আমি অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলাম। আমি যে বুঝতে পারি নি, তা বুঝতে পেরে তিনি বল্‌লেন, খুকীকে আমায় একবার খানিকক্ষণ পরে এনে দিতে হ'বে। আমি তা'কে নিয়ে একবার কালীতলাতে যাব। আজ তোমাতে আমাতে বোধ হয় শেষ দেখা। ব'লে তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন। সত্যি বলচি চরণ-দা, আমি কেঁদে ফেললাম।

চরণ আগ্রহে বলিল—তারপর?

—তারপর,—তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিজের দাড়ি গোঁফ কামিয়ে ফেল্‌লেন, এই প্রথম তিনি গোঁফ ফেললেন! তাঁর ছিলো লম্বা গোঁফ। তার পর লাল ব্যাগ থেকে মেয়েছেলের গহনা কাপড় পরে নিজে মেয়েছেলে সেজে নিলেন। ঠিক অবিকল মেয়ে মানুষ সেজে, আমার দিকে একবার হাস্‌লেন। আমি অবাক্ হ'য়ে তখনও চেয়ে রয়েছি। বাক্সের ভেতর কত রকমের জিনিষ। তারপর বাড়ী-ওয়ালীর ছোট নাত্‌নীটাকে ভুলিয়ে তিনি কোলে ক'রে বেড়িয়ে পড়লেন। যাবার সময় ব'লে গেলেন, আমি কি ভাবে গেছি, তা যেন

তুমি কাউকে না বলো অন্ততঃ আমার যাওয়ার এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত,—আর খুকীকে কালীতলার রকে বসিয়ে রেখে যাব। তুমি কেবল তাকে খানিকক্ষণ বাদে সেখান থেকে নিয়ে এসো! আর আমি বাহিরে বেরুলে, তুমি দরজার কাছ থেকে যেন চেঁচিয়ে ব'লো—মাসি যেন দেরী করোনা—শিগ্‌গীর এস! তোমার হাতে আমার প্রাণ—মনে থাকে যেন। ধরা পড়লেই সব শেষ! তুমি আমাকে বাঁচাও, দেশের উপকার হবে, তোমাদের ভাল হবে। তিনি মেয়েছেলে সেজে চ'লে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ পরে খুকীকে কালীতলার রক থেকে আনতে গেলাম। গিয়ে দেখি, তিনি খুকীকে নিয়ে তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। মন্দিরের আরতি হ'য়ে গেছে। লোকজন তেমন নেই। বুঝলাম খুকী তাঁকে ছাড়ে নি। আমি যেতে তিনি আমার কোলে তাকে দিয়ে বললেন—আসি তা হ'লে, বোধ হয়, আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, আজ যদি ধরা পড়ি ত-কথাই নেই। তবে তোমার কথা মনে থাক্‌বে, আমার তুমি প্রাণ রক্ষা ক'রেছ। আমি বললাম—আমি আর কোথা প্রাণরক্ষা করেছি। বরঞ্চ, আমার কাছ থেকে আপনার চরিত্রে কলঙ্ক হ'ল। মৃদু হেসে তিনি বল্‌লেন,—আমাদের চরিত্রের কলঙ্ক—আমাদের কলঙ্ক সবই। তাই জন্যেই ত তোমাদের কাছে ভিন্ন আর কোথাও আমাদের স্থান নেই। তোমরাও যেমন আশ্রয়হীন, আমরাও তাই। আমি বল্‌লাম—আমরা মন্দ কাজ করি, তাই আশ্রয়হীন; কিন্তু আপনি কেন আশ্রয় পাবেন না, আপনি ত কোন মন্দ কাজ করেন না? আমার বিশ্বাস—কখন করতেও পারবেন না। আমার হাত দু'টো পুনরায় ধরে বললেন—সত্যই এই আশা ক'রেই পথে বেরিয়েছি। বাপ মা ভাই বোন তারা আমায় আশ্রয় দিতে সাহস করে নি—তোমার কাছে আশ্রয় পেয়েছি, তুমি আমাকে

মন্দের জন্য পেড়াপিড়ি করনি। তাই জন্যই তোমাকে ভালবেসেছি, তুমি যে আমার দেশের কি উপকার ক'রেছ তা আজ বুঝবে না। আমি সবাইকে অনায়াসে ছেড়ে চলে এসেছি, আজ তোমায় ছেড়ে যেতে সত্যই মায়া হ'চ্ছে। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি, আজ এতক্ষণ এত কথা কইচি কি করে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে। এখানে যদি আমায় ধরে ত.আমার আজই শেষ। আমি বল্লাম—তবে আপনি যান। আপনার শেষের কথা মনে থাক্‌বে। পরে যদি কোন দিন দেখা হয় মনে রাখবেন।—ব'লে তাঁর পায়ের ধূলো নিলাম। তিনি হাস্‌তে লাগলেন। চলে যাবার সময় বললেন—আজ যদি বাঁচি তবেই। তারপর তাঁর সেই চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মার কাছে সেই একবার মনপ্রাণ দিয়ে তাঁর জীবন ভিক্ষা ক'রে মানৎ করেছিলাম। আজও জানি না, তা সফল হ'য়েছে কি না। তাঁকে দেখ্‌তে একবার ইচ্ছে হয়।

চরণের ঘুম আসিতেছিল। সে বলিল,—ঠিক আমার বাবুর মতন কথাবার্ত্তা।

চরণ বলিতে বলিতে কপালে হাত ঠেকাইল। পুনরায় বলিল,—হারানী! সার্থক তোর মানৎ।

হারানী হাসিল।

ঘড়িতে তখন একটা বাজিল।

আষাঢ়ের দিন। চারিধার বেশ মেঘলা-মেঘলা করিয়া আছে। জলবৃষ্টি হইবার নামও নাই। সাধুর মা এই কয়দিন হইতেই যাই যাই করিয়াও বিশুদের বাড়ী আসিতে পারেন নাই; পাছে কখন আবার

ঝড় বৃষ্টি নামিয়া আসে। অথচ, এই মাসাবধি তিনি শুনিয়া আসিতে-ছেন যে বিশুর ঠাকুর-মার বড় অসুখ। কি করেন—আজ আকাশে একটু মেঘ ছাইয়া ফেলিতেই তিনি এই মেঘের ছায়ায় ছায়ায় সাধুকে সঙ্গে করিয়া সেই দুপুরেই বিশুদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাহিরের কক্ষে চরণের সহিত তাঁহার দেখা হইতেই চরণ অত্যন্ত সমাদরে তাঁহাকে ঠাকুর-মার কক্ষে লইয়া গেল; বাড়ীটি তখন নিস্তব্ধ দিবা-নিদ্রায়—বৌয়েদের কক্ষে খিল আঁটা! সাধু মাকে পৌঁছাইয়া দিয়া বৈকালে আসিবে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর লইয়া পূর্ব্বেই চলিয়া গি" ছে। অতএব তিনি চরণের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর-শা তখন মেঝেয় বালিশ ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, হারানী এই অবসরে তাঁহার বিছানা ঝাড়িয়া মুছিয়া ঠিকঠাক করিয়া দিতেছিল। আর ঠাকুর-মার কাছে ন্তি বসিয়া খৈয়ের ধানগুলি বাছিতেছিল। সাধুর মা কক্ষে প্রবেশ করিয়াই ঠাকুর-মার পদধূলি লইলেন। ঠাকুর-মা তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। সাধুর মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—যে তিনি কেমন আছেন। তিনি করুণ স্বরে বলিলেন,—আর মা,—গেলেই হয়, বাবা শম্ভুনাথ কি সুখেই যে আমায় বাঁচিয়ে রাখলেন তা' তিনিই জানেন—বলিয়া একটি উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া লইলেন। পুনরায় বলিলেন, —আর মা, তোরাও আসিস্ না,—আর আস্‌বিই বা কোন্ মুখে—ছেলেরা যে ব্যবহার করেছে, তা'তে যে আমাদের মুখ দেখান—

—খুড়ীমা, ওসব কথা ছেড়ে দিন। আমি রোজই ভাবি আস্‌বো আসবো—আসা আর ঘটে উঠে না। আর অতখানি পথ—একা আসতেও পারি না।

—আর আমায় ভুলাসনি, দুর্গারাণী—আমি সব বুঝি, হীরেন যখন

ছিলো তখন বুঝি বাড়ীটা কাছে ছিল—মা?

দুর্গারাণী নীরব হইয়া রহিলেন।

—সেদিন অনন্ত এলো—বাহিরে থেকেই চলে গেল, আমার সঙ্গে দেখাও করলে না।—যাদের বাড়ীতে এসেছিল তারাই যদি দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয় ত আর বাড়ী ঢোকে কোন্ মুখে।

দুর্গারাণী ব্যথিত স্বরে বলিলেন—আপনি কিসব বলচেন খুড়ীমা—কে কা'কে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে?

ঠাকুর-মা চোখ মুছিয়া বলিলেন,—শুধু জুতো মারলেই কি জুতো মারা হয়—না, মুখের কথাতেও লোককে জুতো মারা যায়—তাড়ান যায়।

দুর্গারাণী লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন,—আপনি কি যে বলেন খুড়ীমা, তার ঠিক নেই।

তিনি বলিলেন,—সব ঠিক আছে মা দুর্গারাণী, সব ঠিক আছে, আমি এখনও মরিনি, পাগলও হইনি—এখনো বেঁচে আছি। পরে একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা মা, আমায় ছুঁয়ে একটা দিব্যি করতে হ'বে,—করবি ত?

দুর্গারাণী শঙ্কিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিসের দিব্যি, খুড়ীমা?

তিনি বলিলেন,—বল সত্যি বল্‌বি? আমার পা ছুঁয়ে আছিস মনে থাকে যেন।

দুর্গারাণী কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—হাঁ খুড়ীমা, জান্‌লে আমি নিশ্চয়ই বলবো, আপনার কাছে আর কি লুকবো।

হারানী ঠাকুর-মার ছেলেমানুষের মত কার্য্যকলাপ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত কথা কয়টা শুনিবার জন্য হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। লতির হাতের

কাজও হাতের মধ্যে রহিয়া গেল।

—সেদিন পঞ্চু মোড়লের সাম্‌নে নাকিসুরে গোবিন্দর মাথায় হাত দিয়ে বলেছে যে, সে তোমাদের টাকা নেয় নি, ও সব কথা সে জানে না? বল, লুকালে চলবে না, বল, তোমার মুখ থেকে না শুনলে আমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না যে, সে আমার ছেলে হ'য়ে এমন কাজ করেছে—বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দুর্গারাণী কি উত্তর দিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। ঠাকুর-মার ক্রন্দনে উপস্থিত সকলেই ব্যথিত হইয়া পড়িল। অনেক পীড়াপীড়ির পর তাহাকে সে-কথা স্বীকার করিতেই হইল। স্বীকারের পর ঠাকুর-মা কেবল কাঁদিতে লাগিলেন, আর কোন প্রশ্নও তিনি করিলেন না। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, যাও মা, যাও, এবার সয়তানীদের জাগ্‌বার সময় হয়েছে, আবার তোমায়ও কিছু অপমান করবে। এই বেলা পালাও!—

দুর্গারাণী ইহাতে কিছুমাত্রও বিচলিত হইলেন না; কারণ জানিতেন, এ আশঙ্কা অমূলক নয়। বার্দ্ধক্য-জরা-পীড়িত পুত্র-হারার প্রাণে বধূদের ও পুত্রদের কঠোর ব্যবহার সত্যই এমন নির্ম্মমভাবে লাগিতে পারে।

এসব কথার অল্পক্ষণ পরেই মেজ-বৌ তথায় আসিল, শ্বাশুড়ীর কাছে কিছুক্ষণ বসিয়া দুর্গারাণীর সঙ্গে অতি সঙ্কোচের সহিত দুই-একটা অপ্রয়োজনীয় কুশল-সংবাদাদির কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া গেল। দুর্গারাণী আরো কিছুক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন, ভাবিয়াছিলেন বোধ হয় যে, সেজ-বৌ এবার আসিবে, কিন্তু সে আসিল না। তাহার না-আসার একটু নিগূঢ় ইতিহাস ছিল। তাহার কারণ পঞ্চু মোড়লের সম্মুখে তাদের টাকার ঐরূপ ভাবে নিষ্পত্তি হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে ঠাকুর-মা সেজ-ছেলেকে এবং সেজ-বৌমাকে তাঁহার ঘরে ঢুকিতে মানা করিয়াছেন।

যাইবার পূর্ব্বে দুর্গারাণী বলিলেন,—খুড়ীমাকে যে কথা বলতে এলাম, সেই কথায়ই এখনও বলা হ'লো না।

তিনি ম্লান মুখে বলিলেন,—কি কথা মা, ওর পরে আর কি কথা আমার সঙ্গে থাক্‌তে পারে?

ওকথা কাণে না তুলিয়াই দুর্গারাণী বলিলেন,—আজ ক'দিন ধ'রে বিশু আমাদের বাড়ীর চৌকাট মাড়ায়নি—কেন বলুন ত; ওদের সঙ্গে টাকা নিয়ে কি হ'য়েছে, তা'তে ছেলেয় ছেলেয় কি হ'লো? সাধু রোজ সন্ধ্যের সময় বলে,—মা, আজও বিশু এলো না,—ওদের ওখানে যেতে লজ্জা করে যদি কেউ কিছু বলে। আমি এত ক'রে বুঝিয়ে বলি,—ওরে, তোরা এখনও ছেলেমানুষ, তোদের কেউ কিছু বলবে না,—তবুও বুঝে না। আজ কত ক'রে ধ'রে বেঁধে বুঝিয়ে সুজিয়ে বলায় তবে আমায় এপর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছিল। তাও এক দণ্ড দাঁড়ালে না। বিশুকে এক'দিন দেখতে না পেয়ে বাছার আমার পড়াও ত্যাগ হ'য়েছে, খাওয়াও ত্যাগ হ'য়েছে। তাই ভাবলাম,—খুড়ীমাকেও একবার দেখে আসি, আর অমনি বিশুরও খোঁজ নিয়ে আসি—আর এই ব'লেও আসি যে, আসচে রবিবারে সে আমার ওখানে দু'বেলা খাবে।

ঠাকুর-মা একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—আমায় বল্লে কিছু হ'বে না মা, যাঁরা তাকে তোমাদের ওখানে যেতে মানা করেছেন, তাঁদের বলগে, দেখ যদি মত পাও, আমি ত এখন বাড়ীর কেউ নই!

সেজ-বৌ সে কক্ষে আসিল না, অতএব সসঙ্কোচে তাহাকেই পাহাড়ের নিকট যাইতে হইল—অর্থাৎ দুর্গারাণী সেজ-বৌয়ের ঘরে গেলেন। বেশী কিছু কথা হইল না। দু'এক কথার পর তিনি তাহার সংক্ষিপ্ত

বক্তব্যটুকু ব্যক্ত করিয়া বিশুর যাওয়ার মত লইয়া চলিয়া গেলেন।

বাড়ীতে ঢুকিতেই সাধু আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—হাঁ মা, বিশুর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিলো ?

মা পুত্রের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, না দেখা হয়নি বটে, তবে রবিবারে যা-তে আসে, তার ব্যবস্থা ক'রে এসেছি ! সবাইকে বলে এসেছি ; সেজ-বৌও বলেছে পাঠিয়ে দেবে।

এ সংবাদে তাহার মন ভরিল না। আজ বুধবার, এখনও রবিবার আসতে চারদিন দেরী ! এ ক'দিন সে কেমন করিয়া কাটাইবে ! মা যদি বুদ্ধি করিয়া বলিয়া আসেন কাল, তবুও হয় ! তা না সে-ই রবিবার ! প্রাণের এ আগ্রহ জানাইবার নয় ! একেই ত বন্ধুমহলে, পাড়ার ছেলেরা তাহাদের দুইজনের প্রতি কত ঠাট্টা বিদ্রূপ, এমন কি হিংসার ইঙ্গিতও মাঝে মাঝে করে। বিশু সাহসী, সে সেসব কথা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে না ; কিন্তু সে একটু ওসব বিষয়ে লাজুক, তাই লজ্জায় মরিয়া যায় ! তথাপি সে তাহাকে ছাড়িতেও পারে না। এইত ক'দিন তাহার ভাল করিয়া পাঠাভ্যাস হয় নাই। সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাহার প্রাণ উন্মুখ হইয়া আছে, তবুও ত সে একবার সাহস করিয়া শ্মশানের ধারে যাইতে পারে নাই ! কি জানি, যদি বিশু তাহার সহিত দেখা হইলেও কথা না কয় ! তখন সে বাঁচিবে কোন্ প্রাণে ! তাহার প্রাণ কি তাহার মত তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছে ? তাহার মত কি সে ভাবিতেছে ? তাহার মত কি সে নিদ্রায় স্বপ্ন দেখে ?—না, তাহা কখনই নয়, তাহা হইলে সে একদিনও একবার আসিয়াও বন্ধুর সংবাদ লইত ! তবে !

এইরূপ বন্ধুপ্রীতির মোহন রূপকথা নানান্ রূপ ধরিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে মান অভিমানের দোলায় দুলিতে লাগিল। কখন কখন ব্যথার ভরে তাহার বুক নুইয়া পড়িতে লাগিল, আবার কখন কখন আশায়

তাহা চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল।

এমনি করিয়াই সে এ কয়টা দিন কাটাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু মার কাছে সে কিছুতেই লুকাইতে পারে নাই। তাঁহার কাছেই সে কেবল মাত্র ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। তাই মায়ের আজ এই অভিযান!

লতি বিশুকে বলিল,—দাদা কাল সকালেই ত অনন্তকাকাবাবুর ওখানে যাবে?

—না, সকালে ত একরকম যেতেই পার্‌বো না, যদি যাই ত বিকেল নাগাত যাব—বলিয়া বিশু নিজের কাজ করিতে লাগিল।

লতির মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, বলিল,—যদি যাইত কি? কাকীমা অমন ক'রে বলে গেলেন, সেজ-কাকীমাও ত তোমায় কাল ওখানে যেতে বল্লেন।

—তা বল্লে কি হ'বে, আমাদের ক্লাবের কাল সকালে যে মিটিং; কাল ভোরের ট্রেণে ছ'জন ভদ্রলোক কল্‌কাতা হ'তে আস্‌বেন তাঁদের জন্য আমায় ব্যস্ত হ'য়ে থাকতে হ'বে।

লতি বলিল,—কিন্তু তাঁদের খাবার গুলো ত নষ্ট হবে।

বিশু তৎক্ষণাৎ বলিল,—তা' কি করবো বল,—আমি ত আর ইচ্ছে ক'রে যাচ্ছি না।

ঠাকুর-মা বলিলেন,—ওরে সাধু তোর আশায় পথ চেয়ে বসে থাক্‌বে। বিশু সাধুর কথায় হঠাৎ রাগিয়া বলিয়া উঠিল,—তা ব'সে থাকুক, আমি কি করবো?—বাবুকে আমাদের ক্লাবে ভর্ত্তি করবার জন্যে বাড়ীতে লোক পাঠান হ'ল—বলা হ'ল, আমি ও-ক্লাবের মেম্বার হ'তে পারবো না;—অত বড় ছেলে হ'তে চল্‌লো, এখনও গাছে চড়্‌তে পারেন না,

সাঁতার কাট্‌তে পারেন না ;—কেবল পড়া আর পড়া। ভীতুর একশেষ! বেশ তুমিও আমার ক্লাবে ভর্ত্তি হ'লে না, আমিও তোমার বাড়ীতে যাবো না। আবার লতির বলা হ'চ্ছিল—সাধু আমায় বড় ভালবাসে।

ঠাকুর-মা বলিলেন,—সে ভাল মানুষ, তোদের সাতপাঁচের ভেতর থাকতে চায় না ; তা'বলে কি সে তোকে ভালবাসে না ?

সে জোরের সহিত বলিল,—না, আমি অমন ভালবাসা চাই না ;— আমার কথা শুন্‌তে পাঁচবার ভাব্‌বে, তারপর আবার শোনা হ'বে না, আমার অমন বন্ধুত্ব চাই না।

সত্যই, সাধু তাহাদের ক্লাবের সভ্য হয় নাই বলিয়া বিশুর বেশ কিছু রাগও হইয়াছিল, অভিমানও হইয়াছিল। তাহার কথা সাধু না শুনার দরুণ বন্ধু-মহলে তাহাকে বেশ একটু অপদস্থও হইতে হইয়াছিল।

ঠাকুর-মা হাসিয়া বলিলেন,—কি কর্‌বে বল ? তোর মত যদি সবাই দুরন্তপনা না করতে পারে।

—কেন আমি কি দুরন্তপনা করেছি বল ?

—তুই কুস্তি করবি, লাঠি খেলবি, গান বাজনা করবি, সারাদিন টো টো ক'রে ঘুরবি, তোর মত কে পারবে বল ? আর ওর লেখ-পড়াটি ত আছে।

—বেশ ত ঠাকু-মা—আমি ত বলচি না, ও সব করুক, আমার সঙ্গে মিশুক ; ও আমার কথা শুন্‌বে না—আমিও ওদের ওখানে যাবো না, ব্যস, চুকে গেল কথা—বলিয়া সে তথা হইতে চলিয়া গেল।

ঠাকুর-মা বুঝিলেন এ অভিমানের কথা। তথাপি তিনি লতিকে বলিলেন,—ও যে একগুঁয়ে, হয়ত কাল যাবে না। তুই একবার ব'লে ক'য়ে পাঠিয়ে দিস্ দিদি, তোর কথাই শুনবে।

লতি মনে মনে ব্যথিত হইয়া বলিল,—এ দাদার ভারি অন্যায়।

ঠাকুর-মা তাড়াতাড়ি বলিলেন, দেখ দেখি, দেখ দেখি অন্যায় নয়,—মা আমার কত পথ হেঁটে বল্‌তে এলো—আর বিশু বলে যাব না—এ অন্যায় নয় ? এতে তারা দুঃখ পাবেনা ?

কিন্তু, যে যাবে না বলিয়া চলিয়া গেল, তাহারও দুঃখের অন্ত রহিল না। সেও পুকুর-পাড়ে বসিয়া সম্মুখের আম গাছটার দিকে চাহিয়া তাহাদের কথাই ভাবিতে বসিল। মা কবে এ বিশ্ব হইতে চিরবিদায় লইয়াছেন, তাহা তাহার মনে নাই। তাঁহার মুখখানির স্বরূপও তাহার স্পষ্ট মনে থাকিবার কথা নহে; কিন্তু সেই অস্পষ্ট মাতৃ-মুখখানিকে উদ্দেশ্য করিয়াই, সে আজ কাঁদিতে লাগিল। সাধুকে না-দেখার ব্যথা, তাহার ক্লাবের না ভর্ত্তি হওয়ার অপমান, পরে তাহাদের ঐ অযাচিত স্নেহের আকুল নিমন্ত্রণ তাহাকে আজ অভিমানে, শোকে, সত্যই ব্যথিত করিয়া তুলিল।

পরদিন খুব ভোরে লতি উঠিয়া দাদাকে জাগাইল। কারণ, বিশুকে ক্লাবের আজ অনেক কাজই করিতে হইবে, তাই সে তাহার ছোট বোনটিকে পূর্ব্বরাত্রে এইরূপই আদেশ দিয়া রাখিয়াছিল। যাইবার সময় লতি আর একবার নিমন্ত্রণের কথাটা স্মরণ করাইয়া দিল। বিশু জুতা পরিতে পরিতে বলিল—কাল রাত্তির থেকে ত একশ'বার হ'ল, তাতেও কি আমার মনে নেই লতি ? বলছি ত—যাব-যাব-যাব—কিন্তু কখন যাব তা ঠিক বল্‌তে পারচি না—বলিতে বলিতে সে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

লতি একটু অগ্রসর হইয়া সসঙ্কোচে বলিল—একটু শিগ্‌গীর যেতে চেষ্টা ক'রো তা ব'লে।

বিশু কোন উত্তর না দিয়া দুড়দুড় করিয়া নামিয়া বাহির হইয়া গেল।

কলিকাতা হইতে যাঁহাদের দুইজনকার আসিবার কথা ছিল, তাঁহা-

দের মধ্যে একজন আসিলেন। ক্লাবের সভ্যেরা ইহাতে কিছু মন ক্ষুণ্ণ হইল বটে, কিন্তু তাহাদের উৎসাহের কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেল না। গ্রামের অপর একজন ধনী ব্যক্তিকে সভাপতি করা হইল। যে স্বদেশী ব্যক্তিটী সহর হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি স্বদেশী বক্তৃতার চূড়ান্ত করিয়া, নূতন ক্লাবের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সেকেণ্ড ক্লাসের কামরায় সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে বারটার ট্রেণে সহরে রওনা হইলেন।

ক্লাবের সভা-ভঙ্গ হইলে বেঞ্চ, সতরঞ্চ, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি যা-কিছু ছোট-খাট খুচরা জিনিষ পত্তর, সবই প্রায় বিশু আর গণেশকে গুছাইয়া তুলিয়া রাখিতে হইল। তাহাতেও বেশ কিছুক্ষণ গেল।

এদিকে সাধু তার বাহিরের ঘরের জানালাটির পার্শ্বে পথটীর দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে—কখন বিশু আসিবে। সে মিটিংয়ে যাইতে পারিত, যাই নাই! সে যে ক্লাবের মেম্বর হয় নাই, সেইজন্য তাহার লজ্জা ছিল। হয়ত সেস্থানেই তাহাকে কেহ কিছু বলিবে; হয়ত কেহ বলিবে না—তাহার দিকে তাকাইয়া ঘৃণার এবং অবজ্ঞার দৃষ্টি বর্ষণ করিবে। সে বলার চেয়ে এই না-বলাটা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না তাহা সে জানিত; অতএব না-যাওয়াটাই সে স্থির করিয়াছিল।

মা বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—সাধু, যা না, একবার দেখে আয় না—কেন এত তার দেরী হ'চ্ছে। বড় যে দেরী হ'য়ে গেল।

মাতাকে লজ্জায় সে কোন কথা বলিতে পারিল না। বলিল,—এই আসে ব'লে—তুমি সব ঠিক কর মা; বাবা আহার করেছেন?

—তিনি ত আহার ক'রে বিশ্রাম করছেন। যা দেখ্ বাবা একবার,—আমি এধারে দেখিগে—বলিয়া তিনি বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সাধু আসার আশায় উৎকণ্ঠায় পুনরায় পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সত্যই বিশুকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সেই পথে দ্রুতবেগে আসিতে দেখা গেল। সাধু তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর গিয়া মাতাকে সংবাদ দিয়া, গাড়ু হাতে করিয়া খিড়কির পুকুরের দিকে চলিয়া গেল। মাতা বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিলেন এবং একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

বিশু আসিয়া নিজের দেরীর কিছু কৈফিয়ৎ দিল; তৈল মাখিয়া স্নান করিল।

বিশুর স্নানাদি সারা হইলে সে একবার সাধুর সংবাদ লইয়া পাতে বসিল। সাধুও প্রায় সেই সঙ্গে সেই স্থানে অপর একটী আসনে বসিতে বসিতে বলিল—মা নেবু টেবু দিয়েছ ত?

মা হাসিয়া বলিলেন—হাঁ, হাঁ, দেওয়া হ'য়েছে, তুমি খেতে ব'সো। মা বুঝিলেন, পুত্র তাহার প্রথম কথা পাড়িবার লজ্জাটা কাটাইবার জন্যই একথা বলিল। মা একখানি পাখা লইয়া দুইজনের পাতের মাছি তাড়াইতে লাগিলেন।

দুই একটী কথার পর সাধুর মা বিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সহর থেকে যিনি এলেন, তিনি কি বল্লেন?

ঠিক এই কথা শুনিবার জন্য সাধুর মনেও এতক্ষণ সে-ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

বিশু খাইতে খাইতে বলিল,—এই স্বদেশী জিনিষ কেনবার জন্যে অনুরোধ কর্‌লেন, এই গ্রাম থেকে যাতে অস্পৃশ্যতার পাপ মুছে যায়, তার জন্য ক্লাব যেন প্রাণপণ চেষ্টা করে, আর তাঁত, চরকা, স্কুল বসিয়ে গ্রামের উন্নতি করবার চেষ্টা করে। হাঁ—আর গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকের একটি দল তৈয়ারি কর্‌তে বল্‌লেন, তারা লোকের বিপদে-আপদে

সাহায্য করবে, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়বে, আরো অনেক ভাল ভাল সব কাজ করবে।

মা হাসিয়া বলিলেন,—তা বেশ, তা হ'লে তুমি একজন পাণ্ডা হ'য়ে এসব কাজই করবে, কেমন?

বিশু ধীরে ধীরে জানাইল,—সেও থাকিবে, আরো অনেকজনও থাকিবে! বিশু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—একাজ কি করা মন্দ মা?

মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—না, মন্দ কে বলে? ভালই, কিন্তু এ পোড়া গ্রামে একাজের লাঞ্ছনা যে অশেষ বিশু।

বিশু তাচ্ছিল্য স্বরে বলিল,—তা একটু কষ্ট অসুবিধা হ'বে বৈকি, কিন্তু করতে ত হ'বে সবাইকে, করা ত উচিত সবাইয়ের।

মা নীরব রহিলেন। বিশু পুনরায় বলিল,—আমার জন্যে ভেব' না কাকীমা, আমার ঢের কষ্ট সহ্য করা অভ্যেস আছে, আমি খুব এসব কাজ পারবো। বাবা বলতেন,—ভালকাজ পারবো না বলতে নেই, মন্দ কাজ পারবো না বলতে শিখো।

সাধু সব শুনিয়া যাইতেছিল। মা আর কোন কথা বলিলেন না। খাওয়া শেষ হইলে তারা দুই বন্ধুতে বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল। মা আহারে বসিলেন।

বাহিরের কক্ষে আসিয়া দুই বন্ধুতে আজিকার মিটিংয়ের কথা চলিল। অনেক কথার পর সাধু বলিল,—আমাকে নিয়ে তোমাদের ক্লাবের কি হ'বে? আজ-বাদে-কাল একরকম গ্রাম ছেড়ে আমাকে সহরে পড়তে যেতে হ'বে। কবেই বা তোমার ক্লাবের সভ্য হবো, আর কবেই বা তোমাদের কাজ করবো।

এমন সময় সাধুর পিতা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি বলিলেন,—আজ তোমাদের নাকি নতুন ক্লাবের সম্বন্ধে কিসের মিটিং

ছিল? অবিনাশ বাবু এসেছিলেন?

—না, পাল মশায় এসেছিলেন, তাঁর শরীর খারাপ, তাই আসতে পারেননি।

—কি সব বল্লেন? সভার কাজ সব ভালয় ভালয় মিটে গে'ছে ত, পাড়ার যে সব লোক! নিজের গ্রামের ভাল ত দেখতে পারবে না। আমি তোমাদের এ সভাতে যেতাম, কিন্তু কলকাতা হ'তে আসতে দু'দিন দেরী প'ড়ে গেল।

তারপর বিশু অদ্যকার সভার সকল বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিল। অনন্তবাবু সব নীরবে শুনিলেন। বলিলেন,—সবই ত কথা ভালো, কিন্তু তোমাদের যে কয়জন একাজ করবে, তাদের ভেতর মিল হওয়া চাই। টাকা কড়িও ত কিছু চাই ফাণ্ডের জন্যে। একটা আফিস-ঘর গোছেরও ত চাই?

বিশু হাসিতে হাসিতে বলিল,—এসব একরকম জোগাড় হয়েছে। তিনকড়িরা জুটমিলে কবে গেছে, তাদের সেই দু'খানা খোড়ো ঘর ভূপতি বাবু আমাদের ব্যবহার করবার জন্যে দিয়ে দিয়েছেন, আর টাকা কড়ি কিছু চাঁদায় ক'রে আর তাঁর দানে কুলিয়ে যাবে'খন।

অনন্ত বাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন—যাক্, তাহ'লে ভূপতি-বাবুকেও তোমরা দলে এনেছ, বেশ। এখন কি কি কাজ আরম্ভ করবে মনে করেছ?

বিশু বলিল,—তা ত এখন ঠিক হয়নি, আজ সবাই মিলে ঠিক করা যাবে। আপনি ত এসে পড়েছেন, আপনি একটা উপদেশ দিন না!

তিনি সস্নেহে বলিলেন,—উপদেশ দিতে আমার পয়সা খরচা নেই; উপদেশ দু'একটা দিতেও যে না পারি তাও নয়, কিন্তু তোমায় আমি আমার পুত্রের চেয়েও কম ভালবাসি না; তোমায় উপদেশ দেওয়ার

চাইতেও বেশী জিনিস আমার দেবার আছে। তোমার পিতা যে আমার কি ছিলেন তা আমিই জানি। তাই বলি, তোমরা যা কাজ করতে নাব্‌চো সে ত কেবল উপদেশের কাজ নয়, সে দেশের কাজ, কিন্তু—

বিশু ভয়ে ভয়ে কহিল,—আপনি কি তবে আমায় এ কাজ—

তিনি কথার মাঝেই বলিলেন,—না বিশু, এ দেশের কাজ—নিজের ভাই-বোন, মা-বাপের সেবা করা—তাদের ভাল করা—সকলকে এক-করার কাজ,—নিজের এই গ্রামখানিকে স্বর্গপুরী ক'রে তোলা—এ-কাজ করতে যে অতি-বড় শত্রুতেও মানা কর্‌বে না—বাধা দেবে না!

বিশু মনে মনে আনন্দে একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল,—তবে কাকাবাবু?

—তবে কি জান, একাজ করবার যেমন সুখ আছে, তেমন দুঃখও আছে। এ-অভাগা দেশে এ-কাজ ক'রে পরকালে হয়ত কেউ সুখী হ'য়েছে, কিন্তু ইহকালে কারুর মঙ্গল হ'তে আমি আজও দেখলাম না।

বিশু তাঁহার ম্লান মুখচ্ছবি দেখিয়া ব্যথিতস্বরে কহিল,—কাকাবাবু অমঙ্গলের কথা ভাব্‌বেন না—বাবা বল্‌তেন—দেশের কাজের জন্য না-খেতে পেয়ে মরাও মঙ্গল।

তিনি ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে দেখিয়া বলিলেন,—মরার কথা ভাবিনে, তেমন হয়ত ভয়ও করি না; কিন্তু বড় দুঃখ হয় বিশু, বড় দুঃখ হয়! মরার চেয়েও বড় দুঃখ আছে!

বিশু ব্যথিতকণ্ঠে পুনরায় কহিল,—কিসের বড় দুঃখ কাকাবাবু?

তিনি সস্নেহে বলিলেন,—কি যে সে দুঃখ, তা' হয়ত জান্‌তে পারবে একদিন। যাদের জন্যে, যে দুঃখ মোচন করতে, তোমরা যে ক'জন যাচ্ছ; প্রতি পদে পদে দেখ্‌বে—তারাই তোমাদের অশেষ দুঃখ

দিচ্ছে। একদিন দেখ্‌বে হয়ত তোমার পূর্ব্বের দুঃখ হঠাৎ দশগুণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

কথাগুলি বিশু তেমন কিছুই বুঝিতে পারিল না। তথাপি সে তাহার বেদনাতুর নয়ন দুইটি বক্তার বেদনাভরা নয়ন দুইটীর উপরে স্থাপিত করিয়া ভাবিতে লাগিল, সে আবার কেমন!

অনন্তবাবু অল্পভাষী, কিন্তু দেশের কথা হইলে তাঁহার প্রাণ যেন কিছুতে আর থামিতে চায় না।

বিশু ধীরে ধীরে কহিল,—তবে কি যাঁরাই দেশের কাজ করেছেন —সেবা করেছেন—তাঁরাই এত দুঃখ পেয়েছেন শেষকালে?

—নিশ্চয়। নিশ্চয়! তাঁরা নিজের বুকের ঝুলিতে পরের ঐ দশগুণ দুঃখ নেন্ বলেই ত অপরের সেই দশগুণ দুঃখ মোচন হয় বিশু। বড় আরো হও, বুঝতে পারবে সব। একবার সাধুর ও বিশুর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেন; পরে আপন মনেই বলিলেন,—বাঙ্গালা দেশে দেশের সেবা করার মত কঠিন কাজ আর দু'টি আছে ব'লে, আমার মনে হয় না।

—কিসে কাকাবাবু? আমার ত এ-কাজ কর্‌তে প্রাণ নেচে উঠে— কোন দুঃখ হয় না ত। আমার সত্যই দুঃখ হয় অন্যজন এ-কাজ করে না ব'লে। ভাবি, কেমন ক'রে তারা আবার তার বিরুদ্ধে কাজ করে?

তিনি করুণ হাসি হাসিয়া বলিলেন,—তাই ত বলছিলাম। ঐ 'কেনই' দেশের কাজকে কেমন একরকম কঠিন ক'রে তুলছে। তাই আমাদের যা-কিছু ভাল কাজ সেটা হ'য়েছে কঠিন—আর যা-কিছু মন্দ, সেটাই হ'য়েছে সহজ। আজ আমাদের মন্দ কাজ করতে কিছু বাধে না। হাতের লেখা যেমন লিখতে লিখতেই সরে, এও যেন এতদিন পরাধীন থেকে কেমন সরে গেছে। তাই, আজ নিজেদের সমাজে নিজেদের

পাপ কেমন সহজে পুরছি—ধর্ম্মের নামে যতটুকু পারি অধর্ম্ম কেমন অনায়াসে চালাচ্ছি! তাই দেশের সেবা করতে গেলে তারই বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়িয়ে কেমন গর্ব্ব অনুভব করছি। তাই আজ ধার্ম্মিক হ'য়ে কেমন কষ্ট পাচ্ছি, আর অধার্ম্মিক হ'য়ে কেমন সুখে বাস করচি।

বিশু বিস্ময়ের স্বরে বলিল,—কাকাবাবু, সত্যই আপনার কথা কেমন যেন কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারচি না। এই ত আর কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই আপনি বল্‌লেন—দেশের সেবা-উন্নতির মত বড় ভাল কাজ আর নেই, অতি-বড় শত্রুতেও মানা করবে না, বাধা দেবে না করতে, তবে এত কঠিনই বা হ'বে কেন সে? বলিয়া বিশু আগ্রহে তাঁহার দিকে চাহিল।

অনন্তবাবু আরও ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন,—অতি-বড় শত্রুতে যদি বাধা দেয় ত সে বাধা সুস্পষ্ট হয়, তা'র বাধার উপায় নিরাকরণ করা সহজ হ'তে পারে; কিন্তু এ-কাজের বাধা আসে পরম মিত্রদের কাছ হ'তে। অতিশয় আত্মীয়দের কাছ হ'তে,—বিশু, এটাই সবচেয়ে প্রধান বাধা।

—সে কেমন?

— কেমন?—আবার কেমন? যাদের জন্যে দেশের সেবা তাদের নিজ হাতে গড়া বিকৃত সমাজ, লোকাচারে বিকলাঙ্গ ধর্ম্ম, পরাধীনতায় নীচমন পদে পদে বাধা দেবে, তারা যে আমাদের নিজস্ব ধন, তারা আমাদের মিত্র, তাদের যে আমরা অন্তরের সহিত এতদিন ধ'রে লালন-পালন ক'রে—মানুষ ক'রে আসছি। তোমার বাবা যে-দিন শেষ বিদায় নেন্, সে-দিন বলেছিলেন,—দেখ অনন্ত, নিজের হাতে তৈয়ারি অস্ত্র যখন নিজের উপর প্রয়োগ হয়, তখন তা রোধ করা যায় না—বড় কঠিন, বড়

বড় কঠিন! শিশির আমার প্রিয় বন্ধু, সে আমারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে। আমার কাছে তা'র কান্নার অর্থ ছিল—বলিয়া তিনি চুপ করিলেন।

কিছুক্ষণ সকলেই নিস্তব্ধ রহিল। সাধুর মা কখন আসিয়া নীরবে তাঁহার স্বামীর কথা প্রাণ দিয়া শুনিতেছিলেন—কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই। সাধুও একটী কথা বলে নাই। ভাবিতেছিল যে এমন করিয়া কোন দিনই ত তাহার পিতাকে সে কথা কহিতে দেখে নাই।

কিছুক্ষণ পরেই অনন্তবাবুই কহিলেন,—ভাল কাজে হাত দিয়েছ, আজ তোমাদের ক্লাব ছোট, হয় ত ছোটই চিরকালই থেকে যাবে। তাই বলে কি একজন একটা ভাল কাজ করিতে পারিবে না—তা আমি বিশ্বাস করি না। প্রত্যেক মহৎ লোকই প্রায় এমনই ছোট ক্লাব বা অনুষ্ঠান ছোট বয়সে গড়ে তুলেছেন। তাই আজ আশীর্ব্বাদ করি, মরবার আগে তোমাদের ক্লাবের একটী মহৎ কাজও যেন দেখে যেতে পারি। আর সে কাজ যেন তোমার দ্বারাই হয়।

তারপর বিশুর বাড়ীর সম্বন্ধে দুই একটী প্রয়োজনীয় কথা হইলে পর মা দুইজনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, দুই বন্ধুতে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

দেশ বলিতে বিশু ঠিক যে কি বুঝিত, তাহা সে নিজেই জানিত না। হিন্দুর ধর্ম্ম, সমাজ, লোকাচার, সংস্কার বলিতে যে কি বুঝায়, তাহাও সে কোনদিন বুঝে নাই, বুঝিতে চেষ্টাও করে নাই। তাহার সে শিক্ষা ছিল না। এসবের আভিধানিক অর্থ করিয়া চুল চিরিয়া লোকের সঙ্গে তর্ক করিয়া জয় লাভ করিবার মত ক্ষমতা বা মতও তাহার ছিল না। কিন্তু থাকিবার মধ্যে ছিল তাহার অন্তরের অন্তরতম দেশে—অতি নিভৃতে,

বন্ধুর স্মৃতি

একটি ক্ষুদ্রপ্রাণ, কিন্তু তাহার সাড়া ছিল প্রবল। শিক্ষিত দেশভক্ত ধার্ম্মিক মনীষীরা যাহা বলিতেন, কেমন করিয়া—জানি না, তাহার প্রাণে তাহা আঘাত দিত, সাড়া দিত, তাহাকে সেই সকল কার্য্যে প্রণোদিত করিত, অনুপ্রাণিত করিত। পশুদের ছানাগুলি যেমন আপনা হইতেই খাদ্য খুঁটিয়া খাইতে শিখে, এ যেন জন্মাবধি সেই স্বভাবই অর্জ্জন করিয়াছিল।

তারপর কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম ও গ্রামবাসীদের মধ্যেও নানান পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই সামান্য গ্রামের অধিবাসীরা আজ বহুদোষ-ত্রুটির মধ্য দিয়াও জাগরণ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে। অহিংসাই মুক্তির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পথ এই কথাই যেন তাহাদের মনে প্রাণে গাঁথিয়া গিয়াছে।

আজ মুক্তিহারার দল তাহাদের অক্ষম নিঃস্ব হাতে দেশমাতৃকার পূজার জন্য আলোর আরতির পঞ্চপ্রদীপ তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিতেছে। বহুযুগের সঞ্চিত গাঢ় অন্ধকার দূর করিবার পক্ষে হয় ত সে আলোক যথেষ্ট নয়, তথাপি সে বিষয়ে তাহাদের উদ্যম উৎসাহের আজ অভাবও দেখা যাইতেছে না। সামান্য গ্রাম— সামান্যই তাহাদের উদ্যম-চেষ্টা।

পরিবর্ত্তনের ধারা শীঘ্র এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়াছে কয়েকটী জীবনে। সাধু সহরে পড়িতে গিয়াছিল। সে দুই বৎসর কলেজে পড়িয়া পাস করিয়া বি এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিল। কিন্তু হঠাৎ সে পড়া ছাড়িয়া গ্রামে চলিয়া আসিল। অর্থের অভাবের

জন্য সে পড়া ছাড়িল না। পড়ায় তাহার আগ্রহও ছিলনা; কিন্তু তথাপি আজ ইহা ছাড়া উচিত বিবেচনা করিয়াই ছাড়িল।

গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া শুনিল, তাহার প্রিয় বন্ধু বিশুর কারাদণ্ড হইয়াছে। একা বিশুর না, আরো ছোট ছোট চার পাঁচ জন সমিতির সভ্যেরও তৎসঙ্গে দণ্ড হইয়াছে।

সমিতির বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে আজ সে ছোট নয়। সহরের সংবাদ পত্রে তাহার কার্য্য বিবরণী লিপি বদ্ধ হইয়া থাকে। গ্রামবাসীদের নিকট হইতেও প্রচুর পরিমাণে শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে। সভ্য সংখ্যাও দিন দিন তাহার বাড়িয়া চলিতেছে। নূতন নূতন বিভাগও তাহার খোলা হইয়াছে। নানান কর্ম্মের পরিকল্পনা এই সামান্য গ্রামখানিকে যেমন সজাগ করিয়াছে—তেমন সমস্যার পর সমস্যা সৃজন করিয়া বেশ একটু বিব্রত ও করিয়াছে।

ফল কথা, আজ যদি কেহ এই সামান্য গ্রামখানির ইতিহাস লিখিতে বসেন—তিনি উপসংহারে লিখিবেন—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এ গ্রামে আর আজিকার গ্রামের মধ্যে আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মানুষ হঠাৎ জাগিলে এমনই হয়। তাহার চক্ষে থাকে জড়তা, প্রাণে থাকে কর্ম্মের সন্ধানের প্রবল স্পৃহা।

প্রকাণ্ড বাগান বাড়ী। তাহারই দ্বিতলের প্রকাণ্ড হল ঘরে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন মেয়ে ও মহিলা আপন মনে কাজ করিয়া যাইতেছে। কেহ বুনিতেছে, কেহ সূতা কাটিতেছে, কেহ দূরে কাপড়ে রং করিতেছে। উৎসাহের অন্ত নাই। সকলেরই মুখে হাসির জ্যোৎস্না মাখা। কাজও চলিতেছে কথাবার্ত্তাও কিছু কিছু চলিতেছে। এমন সময় সমিতির দুই চারজন বিশিষ্ট সভ্যের সহিত সাধু তথায় প্রবেশ করিল। এতগুলি পল্লী-বালাকে একসঙ্গে এমন কাজে কখন সে আর

দেখে নাই। তাই বিস্ময়ে এবং পুলকে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। গতকল্য সে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার কোন বিভাগ দেখিবার সুযোগ হয় নাই। সে অফিসে বসিয়া অনেকের সহিত আলাপ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

সাধু সমিতির গণমান্য অপরাপর সভ্যদিগের সহিত তাহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। লতির নিকট আসিয়া সাধু বলিল,—হাঁরে লতি তুই এত বড় হয়েছিস্! ঠাকুর-মা ভাল আছেন ত?—দেখি কি কাজ শিখেছিস্!

লতি নমস্কার করিয়া লজ্জায় মাথা নত করিয়া রহিল।

তারপর সাধু ক্ষিতি বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল,—বিশু বল্‌তো লতিকে আমি দেবী চৌধুরাণী করবো। আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বলতাম তা করো, কিন্তু সে যেন শেষ জীবনে আর পরের উপকার ছেড়ে আবার ঘরে ফিরে না আসে। ক্ষিতিবাবু হাসিলেন। লতির মুখ লজ্জায় আরো রাঙ্গা হইয়া গেল। সাধু তাহার কাজের সুখ্যাতি করিতে লাগিল। ক্ষিতিবাবু আরো প্রশংসা পাইবার আশায় সাধুকে কমলার নিকট লইয়া গেলেন এবং তাহার কার্য্য দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন,—কমলা, তোমার হাতে কাটা সূতা ও কাজ একবার দেখাও ত মা! কমলা তাহার হাতে কাটা সূক্ষ্ম সূতা দেখাইল, সূচের কারুকার্য্যগুলি যাহা যেখানে ছিল, দেখাইল। সাধু তাহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া অন্য মেয়েদের কার্য্য দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইল।

কমলা সাধুর কথা কতবার বিশুর নিকট হইতে শুনিয়াছে। যখনই এই বন্ধুর সংক্রান্ত কোন কথা উঠিয়াছে, তখনই বিশু শতগুণে তাহার প্রশংসা করিয়াছে। এমনকি, সে কতবার বলিয়াছে, জগতে

চরণ আর সাধু ব্যতীত তাহার এমন বিশ্বাসের পাত্র কেহ নাই। এই সেই সাধু—যাহার বিদ্যার কথা, বুদ্ধির কথা, এমনকি তাঁহার রমণীয় দুর্ব্বলতার কথাও সে শুনিয়াছে। ইহাকে শতবার মনে মনে সে প্রণাম করিল।

আজ তাহার মনে পড়িল, সেই সেদিনকার কথা, যেদিন বিশুকে তাহার কাকারা কেবল তাহারই জন্য সংসার হইতে পৃথক করিয়া দেয়। সামান্য কথা—কি না,—লতি এত বড় মেয়ে, কেন সে সমিতির পাঁচ-জনের সম্মুখে কাজ করিবে, বিশেষ করিয়া তাহারই সঙ্গে মিশিবে, যাহার মাতার কলঙ্কের কথা আজও এই গ্রামের প্রতিবেশিনীদের প্রাণে ঘৃণা ও ব্যথা দিয়া আসিতেছে। কমলা কত করিয়া মানা করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। নীচের' পরে, দরিদ্রের 'পরে, অসহায়দের 'পরে এই যে দরদ, এ সে কোথা হইতে পাইল? যখনই সে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তখনই উত্তরে শুনিয়াছে দুইটি লোকের নাম, তাহার মধ্যে এক সাধু সেই সাধু, আজ তাহার সম্মুখে! আপনা হইতে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তাহার মস্তক নত হইয়া আসিল।

সাধু সেবা-সমিতির সকল বিভাগ পরিদর্শন করিয়া অফিস-কক্ষে ফিরিয়া আসিল। দেখিল, গতকল্যর মত আজও সেই নরু লাটাইয়ে সুতো গুটাইতেছে। নরু একবার গতকল্যের আগন্তুককে দেখিয়া লইল, তাহার মন কি-জানি-কেন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু বাহিরে তাহার প্রকাশ পাইবার কোন অবকাশ ঘটিল না।

সাধু, নীরেন ও হেমন্ত আসিয়া এক একটি চেয়ার টানিয়া বসিল। নীরেন ও হেমন্ত সমিতির সম্পাদক আর সহকারী সম্পাদক। সেইজন্য সমিতির সম্বন্ধে মতামত জানিবার জন্য তাহারা ব্যগ্র হইল। তাহাদের সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ আর কিছুই নয়, সে এতদিন

কলিকাতায় ছিল, সম্প্রতি কলেজ ছাড়িয়া আসিয়াছে ; অধিকন্তু তাহাদের সমিতিতে গতকল্য অযাচিত ভাবে সভ্যও হইয়াছে। তাহারা তাহাদের কথাবার্ত্তায় হাবভাবে এমন প্রকাশও করিতেছিল যে, সে যদি সমিতির উন্নতিকল্পে কোন অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলেও তাহাদের কোন আপত্তি নাই ; বরং তাহারা সানন্দে তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। অতএব সেবাসমিতির সম্বন্ধে বহু আলোচনা চলিতে লাগিল।

বহুক্ষণ কথার পর নীরেন বলিল, ঐখানে ছিল আমার সঙ্গে আর বিশুর সঙ্গে অ-মিল। সে বল্‌তো,—যতক্ষণ সাধারণের কাজে সাধারণের স্নেহ সহানুভূতি না হ'বে, ততক্ষণ আমাদের সেবা-সমিতির সেবা ব্যর্থ হ'বে। আমি বল্‌তাম,—না ; ভাল কাজ—তা সে যতটুকুই হোক, ব্যর্থ হয় না।

সাধু বলিল,—তা বেশ কথা, কিন্তু কথাটা উঠেছিল কি এই মহিলা-বিভাগ খোলবার সময় ?—না অন্য কোন প্রসঙ্গে !

হেমন্ত উত্তর করিল,—আমার যতদূর মনে আছে, এই প্রসঙ্গেই। এই মহিলা-বিভাগ খোলা নিয়ে সে-ই আমাদের সমিতির মধ্যে সব চেয়ে বেশী ত্যাগ স্বীকার করেছে। সে-ই ক'দিন কি-না হুলুস্থুল এই ছোট গ্রামখানাতে—জানেন আপনি ? এই না আপনি দুঃখ করেছিলেন,—খুব বেশী ত তথাকথিত ভদ্র পরিবারের মেয়েদের দেখলেন না। তা সত্যি, তবুও ত এখন কতজন আস্‌চে। প্রথম—প্রথম—

সাধু হেমন্তের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কহিল,—বিশুকে কি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে এই নিয়ে ?

হেমন্ত বলিল,—কি না করেছে, যখন প্রথম কমলা আমাদের সভ্যা নিযুক্তা হয়। কমলা—যার চমৎকার কাটা ফাইন সূতা দেখ্‌লেন—

সেই যে একটু শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা—চোখ দুটো উজ্জ্বল, ভাসা-ভাসা।

সাধু উত্তরে জানাইল, সে বুঝিতে পারিয়াছে।

তখন হেমন্ত বলিল,—তাকে সভ্যা বলে গণ্য করাতে সকলেত মহা-খাপ্পা, বুড়োরা ত সমিতির কোন সংস্রবে থাকবেন না মনস্থ করলেন, ভয়ও দেখালেন।

সাধু জিজ্ঞাসা করিল,—কেন তাঁদের কি আপত্তি থাকতে পারে?

নীরেন বলিল,—কেন থাক্‌বে না। তাঁরা বলেন সমিতিতে ওসব মেয়ে থাক্‌লে সমিতি দু'দিন পরে অচল হ'য়ে যাবে। আমারও মত ছিল তাই, যতটা অবাধ মেলা-মেশা না হয়—তা করা কর্ত্তব্য। সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র হ'চ্ছে পাঁচজনকে নিয়ে, পাঁচজন পাঁচরকমের লোক; কখন কি ফ্যাসাদ বেঁধে যাবে এই ভয়। হাজার হোক, তাঁরা প্রবীণ, তাঁরা ত এসব ক্ষেত্র পার হ'য়ে গেছেন! তাঁরা বুঝেন ত বেশী! কিন্তু সে শুন্‌লো না। তার নিজের বোনকে সেবা-সমিতিতে ভর্ত্তি ক'রে দিলে, কমলাকে ভর্ত্তি করালে। আরো কত ছোট অস্পৃশ্য জাতের মেয়েদের ভর্ত্তি করালে। গ্রামের প্রবীণরা কিছু কর্ত্তে পারেন না, তাঁরা গিয়ে বাড়ীর কর্ত্তাদের লাগান। ফলে হ'লো এই যে, বিশুকে কাকাদের সঙ্গে পৃথক্ হ'তে হ'লো, তাঁরা বল্‌লেন,—দেখ বিশু, তুমি সেদিনের ছেলে হ'য়ে এই গ্রামের সব শৃঙ্খলা ভাঙ্গবে, তা আমরা কিছুতেই হ'তে দেব না। এক আলাদা হও—লোকে জানুক আমাদের তুমি কেউ নও—না হয় তোমার বোনকে পাঠিওনা ও সমিতিতে, লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায়।

সাধু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—বিশু তাতে কি মত দিলে?

হেমন্ত বলিল,—কি আর বল্‌বে? বল্‌লে, তবে লোকে জানুক

—আমি আপনাদের কেউ নই। আপনারা সুখে থাকুন। পরদিন খাওয়া-দাওয়া সব আলাদা, কেবল বিষয়-আশয়-গুলো এখনও কিছু হয়নি।

সাধু কিছু আর জিজ্ঞাসা না করিয়া কেবল একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

নীরেন সাধুর ভাব গতিক দেখিয়া বলিল,—আমি কত বললাম! ঐজন্যই ত আমার মাসতুতো বোনকে আজও আসতে দিই না। সত্যি, যতটা রয় সয়, ততটা ভাল; অতটা তার বাড়াবাড়ি আমিও পছন্দ করি না।

সাধু কোন প্রতিবাদ করিল না দেখিয়া, সে আরো একটু উৎসাহিত হইয়া বলিল,—দেখুন না, আবার বলতো কি না ছেলে-মেয়েদের এক সঙ্গে সমিতিতে কাজ হোক, তা হ'লে ত গ্রামে আগুন লেগে যে'ত। যাই বলেন, তার অনেকগুণ ছিল মানি, কিন্তু বড় বদসাহসী ছিল! একটুও ভয় ছিল না তার প্রাণে!

সাধু এবার মুখ তুলিয়া বলিল,—তা বটে, বাঙ্গালীর ওটা দোষ বটে! নীরেন বাবু, তার সকলের চেয়ে বেশী ভুল হয়েছে এখানে জন্মান।

নীরেন কিছু বুঝিতে পারিল না। অল্পসময় নীরবে কাটাইয়া বলিল,—আপনি কি মনে করেন, সব একসঙ্গে কাজ করলে ভাল হয়? না, এ আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

এমন সময় আরো কয়জন বিশিষ্ট কর্ম্মী সেই অফিস ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাদের দৈনন্দিন কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, এমন সময় প্রায়ই তাহারা তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতির আলোচনা করিতে এই কক্ষে আসিয়া বসে।

সাধু হাসিয়া বলিল,—এ ভাল কথা, তাই জন্যই বোধ হয় পাঁচজনের ভোট পেয়েছেন! সম্পাদক হয়েছেন! এই মতেরই বিশ্বাস বেশী লোকের এখানে—না?

৬

নীরেন সামান্য একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল, বলিল—সত্যি কি আপনি বিশ্বাস করেন না,—ঐরূপ অবাধ মেলা-মেশাতে সমস্যা আরো জটিল হ'য়ে দাঁড়ায়? সমাজ-শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়ে। যা আজ পশ্চিমের ঘরে ঘরে, যার ভারে তারা আজ ভারাক্রান্ত, তারা এই হিন্দুর দিকে—ভারতের দিকে তাকিয়ে আজ বল্‌তে বাধ্য হয়েছে—এরাই সুখী। এদের সংসারযাত্রার নিয়ম কি সুন্দর!

উপস্থিত সকলেই মনে মনে একটু গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিল এবং নিশ্চিন্তে ভাবিয়া লইল, ইহার পর আর কি উত্তর থাকিতে পারে। কারণ তর্কে হিন্দু আর পশ্চিম দুই কথারই ব্যবহার হইয়া গিয়াছে।

সামান্য গ্রাম—সামান্য তাদের ধারণা।

সাধু ধীরে ধীরে বলিল,—পশ্চিমের সংবাদ তেমন জানি না, যাইনি কিনা, তবে আমাদের দেশের আজকালকার মনীষীরাও বলেন, আর বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও বলেন,—পশ্চিমবাসীরা ভারতের দিকে তাকিয়ে সুখী হয়। এটা যে তাদের ব্যবসার বাজার কিনা তাই, না হ'লে তাদের সুখী হবার এমন কোন কারণ নেই ব'লেই আমার মনে হয়।—আর সমস্যার কথা যা বল্লেন, তা'তেও আমার মনে ঐ কথা, জন্মের একটু ভুল হয়ে গেছে; মানুষ হয়ে না জন্মে যদি অন্য জন্তু জানোয়ার হ'য়ে জন্মাতাম, তা হ'লে এত সমস্যার ঝঞ্ঝাটের ব্যবস্থা ত থাকতই না—এমন কি, সামান্য একটা কাপড়ের জন্যে এত সমস্যার সৃষ্টি ক'রে সেবা-সমিতির বিভাগ খুলে চরকাও কাটতে হ'তো না, আর বিদেশীর সঙ্গে এত দর কষাকষিও করতে হ'ত না। আমি বলি, তাতেও যখন এত সমস্যা, তখন এটা আর বাড়িয়ে লাভ কি? সমস্যাই না যত গণ্ডগোল বাধায়! নয়ত পূর্ব্ব-পুরুষের মত গাছের ছাল, অভাবপক্ষে নিজের গায়ের ছাল পরেই থাক্‌তুম।

—তা ব'লে সমস্যায় ভারাক্রান্ত হওয়া ঠিক না ত! কি বলেন হেমন্ত বাবু! সমস্যা ত এড়াতে চান, কিন্তু সমস্যা ত আর এড়াতে চায় না।

একজন কর্ম্মী বলিল,—আপনি একটু স্পষ্ট ক'রে বলুন।

সাধু হাসিয়া বলিল,—সমস্যা মানুষেই সৃজন করে। যাদের জীবনে সমস্যা নেই, তারা নিম্নস্তরের মানুষ, নয় জন্তু। তারা সভ্যতার শিখরে আজও এগিয়ে গিয়ে আরোহণ করতে পারেনি। যে জাতির জীবনধারা যত সমস্যায় জটিল, সেই জাতিই তত সভ্য ব'লেই ত বিশ্ববাসী গণ্য ক'রে দেখেছে।

নীরেন বলিল,—তবে ত আমরা সমস্যার পর সমস্যাই কেবল সৃজন ক'রে যাই—আমরাও সভ্য হ'য়ে যাব তা হ'লে—আপনার মতে?

সাধু বলিল,—সৃজন করার যদি ক্ষমতা থাকে, তবে ত আপনি আজ সত্যই সভ্য হ'য়ে যাবেন। এই ত আমার বিশ্বাস।

অপর একব্যক্তি বলিল,—তবে সমস্যার সমাধান হ'বে কবে?

সাধু বলিল,—সমস্যার সমাধান মানেই সমস্যার সৃজন! নতুনের তখনই সৃষ্টি হয়, যখন পুরাতন সৃষ্টি তার নিকট হেয় হ'য়ে যায়! আবার তারও ত পুরাতন হবার পালা আসে। সৃজনই ত ধর্ম্ম।

—এও এক সমস্যার সৃজন করলেন আপনি! বলিয়া অপর একজন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসিতে অপর সকলেও যোগদান করিল।

হেমন্ত চুপ করিয়াছিল। বলিল,—আপনি কি মনে করতে চাইচেন, আমি বুঝ্‌তে পারচি না।

একজন রহস্য করিয়া বলিল,—আমরাও না—এমন কি উনিও না বোধ হয়।

আবার হাসির একটা হর্‌রা উঠিল।

সাধু কিছু অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল,—যে বলে, সে অনেকটা মানে বুঝেই বলে, অন্ততঃ এ বিশ্বাস আমায় করতে পারেন।—বুঝলেন না, আদিম যুগে লজ্জা নিবারণের একটা সমস্যা উঠেছিল। তা সমাধান হ'ল, বস্ত্র-সৃষ্টি হ'য়ে। সেই বস্ত্র কিরূপভাবে পরতে হ'বে সে সমস্যার সৃজন হল; তাও যখন রকম বেরকমে সমাধান হ'ল, তখন আবার এলো বস্ত্র-সমস্যা। যার জন্যে আপনাদের সেবা-সমিতির অন্ততঃ একটা বিভাগও আজ খোলা হয়েছে। সমিতি সৃষ্টি ক'রে আবার এই এক সমস্যা—অবাধ মেলা-মেশা। কি ফ্যাসাদ! তবে লজ্জা-নিবারণ না ক'রে, চুপ ক'রে থাক্‌লেই ত ছিল ভাল, পূর্ব্ব পুরুষদের মত এত সমস্যাও হ'ত না, সমাধান করতেও হত না। সময় চলে যে'ত, আমরা সেই আদিমই থেকে যেতাম তৎসঙ্গে একজনকে ইঙ্গিত করিয়া সে বলিল,—কেমন না? সময় এগিয়ে যে'ত, আমি চুপ ক'রে থাকতাম। যেমন পাঁচ বছরের ছেলের হাবভাব যদি পঁচিশ বছরের ছেলের থাকে! কাপড় পরার সমস্যা নেই, পড়ার সমস্যা নেই, যৌবন আস্‌ছে তারও সমস্যা নেই। অতিভদ্র একটি জরদ্‌গব্‌ আর কি!

নীরেন কি বলিবে, কেবল তাহাই এতক্ষণ ভাবিতেছিল। ভাল করিয়া তাহার কথা শুনে নাই। শুনিবার মত ধৈর্য্যও তাহার ছিল না; কারণ তাহার মহা অসুবিধা হইতেছিল এই যে, এতগুলি কর্ম্মীর শ্রদ্ধা-ভক্তি যেমন করিয়াই হোক, সে এত দিন নির্ব্বিবাদে অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে, আজ যদি তাহার ব্যতিক্রম হয়, সেই ভয়েই সে অস্থির। শুনিবার অবকাশ সে পাইবে কোথা হইতে! সেই যুদ্ধের জয়ের আশায় নীরেন যেন ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল,—তবুও যাই বলেন, এমন সমস্যার পর সমস্যা এসে জীবন ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে,—যেটা আমি বলছিলাম, আজ পশ্চিমের হ'য়েছে। শান্তি নেই, কেবল একটা 'কেওস্‌' জীবন।

সাধু বলিল,—নীরেনবাবু, যা হোক, পশ্চিমের উপর আপনার অশেষ দয়া—আহা তারা ভারাক্রান্ত! সুখ নেই! শান্তি নেই। একি কম কথা! নীরেন বাবু, একদিন একজন চৈতন্যদেবকে দেখ্‌তে এসেছিল। সংসারী মানুষ নিজের সুখটি নিয়েই থাকে, চৈতন্যদেব কীর্ত্তন করচেন, কাঁদচেন, নাচচেন, ইত্যাদি। তিনি সব দেখ্‌লেন, শুন্‌লেন, যাবার সময় কেবল বললেন,—আহা লোকটার জীবনে শান্তি নেই। তাতে চৈতন্য-দেবের কি এসে গেছলো! দুটো শান্তির রূপ এক নয়। একজাত আনন্দের পর আনন্দ পেয়েও সুখী নয়। আর একজন কিছু না পেয়েও সুখী নয়! তফাৎ নেই? নিশ্চয়ই আছে। নিজের ছেলের খোরাক পোষাক পিতার যোগান দেওয়ার ভেতর ভার আছে তা'তে আক্রান্ত সে হয় না। কিন্তু অপরের একজন ছেলেকে দিতে গেলেই সেই ভারে আক্রান্ত হ'তে হয়। এই ত আমরা ভারাক্রান্তের মানে বুঝি! কেমন কি না?

যাহারা শুনিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিল,—বেশ সব যেন হ'লো, আমায় আসল কথাটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিন ত। সত্যি কথা কি, আগের কথাগুলো আপনার তেমন বুঝিনি। বলুন দেখি, অবাধ মেলা-মেশায় কি সমাজের মন্দ হ'বে না? আমি বল্‌চি মেয়েমানুষে বেটা-ছেলেয় যদি ঘরে বাহিরে কাজ করে—অবাধে মেলামেশা করে আর কি!

অপর অনেকে সেই ব্যক্তির প্রশ্ন শুনিয়া খুসী হইল। তাহারা যেন এমনিটাই চাহিতেছিল। সকলে একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল। সাধু বুদ্ধিমান, ইহা তাহার দৃষ্টি এড়াইল না। মনে মনে হাসিল। কিছুক্ষণ কোন উত্তর দিবার চেষ্টাও করিল না। একজন তাহাদের মধ্যে অনুরোধ করিয়া বলিল,—বলুন না মশায়, আমাদের শোনবার বড় ইচ্ছে।

সাধু একটু রসিকতা করিয়া বলিল,—কি অবাধ মেলামেশার ফল?

প্রথম ব্যক্তি হাসিয়া বলিল,—কিন্তু স্পষ্ট ক'রে বলবেন, হেঁয়ালি

আমরা গ্রামের লোক তেমন বুঝতে পারি না। আপনি সহর থেকে ঘুরে এসেছেন, কথার জোর আছে!

সাধুও হাসিয়া বলিল,—কিন্তু একথা যত স্পষ্ট হবে, তত অশ্লীল হবে যে? আপনারা মেলামেশার কথাই সহ্য করতে পারচেন না, তার আবার ফলের কথা স্পষ্ট হ'লে ত খুনোখুনি এখানে বেঁধে যাবে।

একজন যেন মরিয়া হইয়া বলিল,—তা হোক, আমাদের বয়স এত কাঁচা নয় যে এত মন্দ হ'বে যাব।

সাধু সেই বীরের দিকে চাহিয়া বলিল,—আমার মনে হয় অবাধ মেলামেশায় মন্দ নেই,—যেমন ১ বছর হ'তে ধরুণ ১১ বছরের ছেলে-মেয়েদের মেলা-মেশায় তেমন কোন মন্দ আছে বলে বোধ হয়? আছে?

নীরেন মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল,—না!

সাধু পুনরায় বলিল,—ধরুণ ৪০ বছর থেকে ১০০ বছরের তেমন দোষ আছে?

হেমন্ত বলিল,—না।

সাধু বলিল,—ধরুণ ১৫ বছর থেকে ৩৫ বছরের—এখন! অনেকের দিকে সাধু ফিরিয়া তাকাইল! কেহ একথার তখন উত্তর দিল না।

সাধু বলিতে থাকিল,—তা'হলে দেখুন, যত দোষ ঐ নন্দ ঘোষের? বয়সের—আর বয়সের সাথীর—মেলা-মেশার নয়। কেমন কি না?

একজন বলিল,—না, মন্দের আবার বয়স কি!

তখন প্রথম ব্যক্তি বলিল,—যারই হোক, মেলামেশার জন্যে ফলটা ত মন্দ হ'বে। তা বয়সেরই হোক, কামনারই হোক, আর যারই হোক। রোধ করতে ত হ'বেই।

—যদি কি রকম, আবার হেঁয়ালি আনচেন?

সাধু বলিল,—নিরুপায়! না হ'লে খুবই অশ্লীল হ'য়ে পড়ে। একটা

এ বিষয়ে গল্প বলি শুনুন। একদিন একটা সহরের ছেলে এক পাড়াগাঁয় বন্ধুর বাড়ীতে গেছ্‌লো। তার বাপ ভারী অশ্লীল-বিরুদ্ধপন্থী। তার বাড়ীতে যখন তার সহরের বন্ধু এলো, তখন খাওয়া দাওয়ার পর কথায় কথায় বন্ধু বল্‌লে,—হরিভূষণ, আমাদের গরুরা ঘাস খায় না। হরিভূষণ ত অবাক্। প্রথম ভাব্‌লে সে ঠাট্টা করচে, তারপর যখন তার বন্ধু দিব্যি করে বল্‌লে, তখন সে ভাবতে লাগ্‌লো—সহরে যা সে দু'একটা গরু দেখেছে তারাও ত ঘাস খায়, যেখানে পায়—তবে? এমন-কি রচনা লেখবার সময়ও ত সে লিখেছে, গরু ঘাস খায়। সকালে উঠে বন্ধুকে বল্‌লে,—দেখি তোর গরু ঘাস কেমন না খায়? গিয়ে দেখে, গরু একটা খুঁটিতে খাট করে বাঁধা, ঘাস খাবার উপায় নেই। তখন সে বল্লে,—গরুর ঘাস খাবার উপায় নেই, ঘাস খায়না কেন বলচিস্। এ ত কম মিথ্যে কথা নয়। তাই বল, গরু আবার ঘাস খায় না! তারপর জিজ্ঞাসা করলে,—তোর গরুর ক'টা বাছুর? সে হেসে ব'ল্লে কেন? বাধা গরুর বাছুরগুলো ম'রে যায় শুনেছি, ঘাস-না-খাওয়া গরুর জীবনীশক্তি থাকে না। শক্তি পাবার আশায় যারা তার দুধ খায়, তারা একদিন ঠকে। দুধ তারা পান করে বটে; কিন্তু সামর্থ্য পায় না।

হেমন্ত বলিল,—তা হ'লে, আপনি কি বলতে চান, সে গরু যতটা বাড়ী ময়লা ক'রে অপকার করে, ততটা দুধ দিয়ে উপকার করে না? ঠিক ঐ ভাব ত আপনার মনে?

সাধু হাসিয়া বলিল,—আপনি ধরেছেন ঠিক; কিন্তু অপকারের মধ্যেও বাড়ীতে ব'সে গোবরটা ঘুঁটেটাও লাভ হয় আর কি! তবে তার দাম এমন বেশী নয়, এই যা!

হেমন্ত বলিল,—কিন্তু এটা মনে রাখ্‌বেন, ঘাস বাইরে যেখানে সেখানে খেলে লোকে ধ'রে রাখতেও পারে, আবার পুলিশের হাতে—

কাঁড়িতেও দিতে পারে। ঘাস খাবার ভেতরও বুদ্ধি থাকা চাই।

সাধু মুচকিয়া হাসিয়া বলিল,—কিন্তু যে তার দুধ খাবে, সে খাঁটীই খাবে। জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেলে একটু সিং নাড়ানাড়ি হ'বে বইকি! কিন্তু গলায় হাত বুলিয়ে ভাল বসে দেখবেন, আপনার দোর-গোড়ায় সে এসে ল্যাজ গুটিয়ে ব'সে আছে। পুরুষ হ'লে লাঙ্গল চাস্‌বে আর স্ত্রী হ'লে দুধ দেবে। যাতে আপনারা জীবনী শক্তি পাবেন!

হেমন্ত বলিল,—যাই বলেন ও কেবল উপমা, সব ক্ষেত্রে ওকথা খাটে না, ওটা ত আর যুক্তি নয়।

সাধু অম্লান বদনে বলিল,—তাত বটেই, তবে গরু হ'লে কিছু খাট্‌তে পারে,—না? আর যা গরুতে খাটে, তা মানুষে খাটা যুক্তিসঙ্গতও নয়, শোভনীয়ও নয়।

হেমন্ত বলিল,—আপনার কথায় কথায় কেবল ঠাট্টা। এসব সিরীয়াস্ ব্যাপার, আপনার কাছে কিছু কিছু শোনবার প্রত্যাশা করেছিলাম।

সাধু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল,—সবটাই ঠাট্টা ভেবেছেন নাকি! তা বেশ, ওটা আমার বয়সের দোষ ধ'রুন না। ছেলে মানুষ হ'লে যা'তা বলতাম, বড়ো হ'লে গম্ভীর হ'য়ে বলতাম—ওসব কিছু 'তোমরা' বোঝনা হে ছোক্‌রা, বড় হও বুঝ্‌বে। আর যে বয়স আমার, তা'তে ফক্‌কুড়ি ইয়ারকি ক'রেই ত বলবো। জানেন ত আগে কেমন মুখচোরা ছেলেটি ছিলাম। এখন কলকাতার মেশে থেকে এমনই হ'য়ে গেছি। আমার এই জন্মভূমি পল্লীমায়ের কোলে থেকে কেবল বাস কর্‌লে এমনটি হ'তে পারতাম না। মায়ের আদুরে ছেলে হ'য়ে থাকতাম আর কি! পৃথিবীতে কি হ'চ্ছে দেখবার দরকার নেই, শোনবার দরকার নেই; অমনি যা আছি তাই ভাল নিয়ে থাকা। কারণ মায়ের আদর ত কম জিনিষ নয়। অজ্ঞতা

নয় রইল তাতে কি, কিন্তু মায়ের কোল !—যাক, মায়েব কথা মনে পড়তেই ভাল হয়েছে, আজ চললাম, কিছু মনে করবেন না, বড় দেরী হ'য়ে গেছে। কি-জানি কি বলে গেলাম !

একজন বলিল,—আমার বেশ লাগ্‌ছিল—আবার এখানে কবে আস্‌চেন বলুন। আমার গোটা দুই প্রশ্ন আছে জিজ্ঞাসা করবার।

সাধু ভয়ের ভান করিয়া বলিল,—কোন সিরীয়াস্ কোয়েস্‌চেন নয় ত দেখ্‌বেন !—যদি এমন হয় ভগবান আছেন কি না। হিন্দুর বৈশিষ্ট্য—সনাতনত্ব—আদি অনাদি প্রব্‌লেম—এসব নয় ত !

তাহার বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া প্রশ্নকারী হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—না মশায়, সামান্য ছেলেমেয়েদের কথা নিয়ে আর কি !

সাধু বলিল,—তা বেশ বয়সের সঙ্গে খাপ খাবে আমার !—বলিয়া একবার সে কাহাকে যেন অন্বেষণ করিল।

নীরেন জিজ্ঞাসা করিল,—কা'কে খুজচেন ?

সাধু বলিল,—ছেলেটা গেল কোথা ? একগ্লাস জল দেবে, বড় তেষ্টা পেয়েছে। নরু না কি নামটা তার !

একজন বলিল,—সে অনেকক্ষণ চ'লে গেছে, আর সে মুসলমান। আমি দিচ্ছি। বলিয়া সে কুজার দিকে অগ্রসর হইতেই সাধু বলিল,—না থাক, আর কষ্ট করতে হবে না—আমি জানতাম সে মুসলমান, কাল তার হাতে জল খেয়েছি কি না। আমরা পশ্চিমি শিক্ষা পেয়ে ম্লেচ্ছ হয়ে গেছি কিনা। একটু ম্লেচ্ছাচার না করলে যেন প্রাণে তৃপ্তি আসে না।

আর কোন কথা না বলিয়া সে সকলকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। সকলেই দেখিল, যাইবার সময় তাহার অবসাদ নাই, ক্লান্তি নাই, মুখে যেন একটা তৃপ্তির হাসি।

প্রায় দেড় মাইল পথ যাইতে হইবে। তাই সে একটু দ্রুতবেগেই

চলিয়াছে, পথের দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। কথায় কথায় অনেক দেরী হইয়াছে, মা ভাত লইয়া বোধ হয় বসিয়া আছেন, ভাবিতেছেন। এ ত আর মেশ বাড়ী নয়! কাহার কে খোঁজ রাখে, আর রাখিবেই বা কেন?

পথের ফাঁকে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ, সেই খানটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন; সেখানে সাধু আসিতেই একজন শিশুকণ্ঠে ডাকিল, আপনি একটু দাঁড়ান।

সাধু আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া দেখিল,—নরু, গতকল্য যাহাকে সে সমিতির অফিস ঘরে আদর করিয়া এবং মুসলমান জানিয়াও তাহার হাতে জল গ্রহণ করিয়াছে। সে হাসিয়া বলিল,– কি মনে করে ভাই এখানে?

নরু নিকটে আসিয়া বলিল,—আপনার জন্যে এখানে দাঁড়িয়েছিলাম।

সাধু হাসিয়া বলিল,—আমার জন্যে? কেন?

নরু বলিল,—আপনার একখানা পত্র আছে—কমলা-দি' দিয়েছেন।

সাধু মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। একবার আপন মনেই বলিল, —কমলা-দি' দিয়েছেন? তারপর প্রকাশ্যে বলিল,—বেশ প'ড়ে দেখবো।

নরু বলিল,—আমাদের ঘর জানেন ত, কোন্ ধারে? ঐ যে ইট্-খোলা আছে, খালের ধারে—যেখানে কালদের গরুটা বাঁধা থাকে দেখেননি!

সাধু বলিল,—আচ্ছা সে আমি খুঁজে নেব যদি দরকার হয়।

নরু নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

পত্রটি তৎক্ষণাৎ পড়িবার আগ্রহ তাহার হইল; কিন্তু তাহার স্বভাবের একটা বিশেষত্ব এই যে, যে বিষয়ে তাহার অত্যন্ত কৌতুহল

জন্মায়, সেটাকে সে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। ইহার জন্য দু'একবার যে বিপদও তাহার হয় নাই এমন নয়।

আজও সে তাই করিল, পত্রটি না খুলিয়া বাড়ীর দিকে চলিল এবং মনে মনে স্থির করিল, আগামী কল্য প্রাতঃকালের পূর্ব্বে সে পাঠ করিবে না। আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। সেই উদার উন্মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া সাধু একবার কি ভাবিল। প্রভাতের নির্ম্মল বায়ু তাহার সেই চিন্তাধারাকে নিজ গুণে স্নিগ্ধ করিতে চেষ্টা করিল।

সে সকল বিষয়ই নিজের চিন্তায় সৃষ্টি করিতে চায়, ইহাই তাহার বিলাস। সে চা পান করিল, তার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া নিজের টেবিলের কাছে গিয়া বসিল এবং পত্রখানি তাহা হইতে বাহির করিয়া খুলিল।

তাহাতে লেখা ছিল।—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

আপনাকে কোনদিন দেখি নাই,—গতকল্য দেখিলাম। আপনার সকল কথা বিশুদার নিকট হইতে কতবার কত প্রকারে শুনেছিলাম; সেই সাহসে ভর করিয়া আপনাকে এ পত্র দিলাম। নরুও কাল আপনার কথা আমায় বলিল। দেখিলাম, বালকেরও চিনিতে ভুল হয় নাই। আপনাকে সুখ্যাতি করিবার জন্য পত্র লিখি নাই; কারণ আপনি সুখ্যাতিরও যে অনেক উপরে, সে বিশ্বাস অপরে কেহ না করুক,—আমি করি। আপনি আমার সঙ্গে সময়মত একবার দেখা করিবেন। কথা আছে। আমার প্রয়োজনীয় কথা। বিশুদা'র কারাবাসের পর হইতে আমি যে নিজকে এখানে বিপন্ন মনে করিতেছি সে কথাই হইবে। বেশী লেখার সুবিধা আজ হইল না। ইচ্ছা ছিল

সব লিখিব ; কিন্তু তাহা পারিলাম না—আর তেমন প্রয়োজনীয়ও বলিয়া মনে হইল না। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম লইবেন। ইতি—

বিনীতা

আপনার স্নেহের

শ্রীমতী কমলা দেবী

পুঃ—দুপুর বেলা আসিবেন না। আমি তখন সমিতির মহিলা-বিভাগে থাকি। অতএব অন্য কোন সময় আপনার সুবিধা হইলে আসিবেন।

পত্রখানি পাঠ করিয়া সাধু কি আবার চিন্তা করিল। তারপর সে পিতার কক্ষে গেল। পিতা বসিয়া একখানি সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে-ছিলেন, পুত্র কক্ষে প্রবেশ করিতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রে সাধু ?

সাধু সম্মুখের একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিয়া বলিল,—বাবা, আজ গোটাকয়েক সংবাদ আমি নিতে এসেছি।

পিতা বলিলেন,—কি বল ? গতকল্য হইতে পিতার মন সামান্য ব্যথিত হইয়াছিল।

সাধু বলিল,—নীরেন বাবু, হেমন্ত বাবু—এরা সব কি রকমের লোক ? আমি কাল সেবা-সমিতির সভ্য হ'য়ে এলুম কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা হ'লো।

পিতা অল্পক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তারপর কহিলেন,—লোক তারা এমন কিছু মন্দ নয়। আচার ব্যবহার বেশ। কিন্তু আমার মনে হয়, এরা সেই শ্রেণীর লোক, যারা সেবার চেয়ে নিজেদের প্রতিপত্তি আর নামটা বেশী পছন্দ করে। সেইজন্য এরা কাজ করে। যেখানে

এরা এটা পায় না, সেখানে আর সহানুভূতি ত দেখায়ই না, অধিকন্তু তার বিপক্ষতা করতে লজ্জাবোধ করে না, তা সে গ্রামবাসীদের ভাল কাজ হ'লেও। এরা দেশের চেয়ে নিজের দলকে বেশী ভালবাসে।

সাধু চিন্তিত হইয়া বলিল,—তবে ত মুস্কিল! আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি।

পিতা বিষণ্ণমুখে একটু হাসি হাসিয়া বলিলেন,—দেড়'শ বৎসরের উপরও যারা ঘরে-বাহিরে পরাধীন—এ তাদের চিরন্তন মুস্কিল। এতে দুঃখ করবারও কিছু নেই, এতে আশ্চর্য্য হবারও কিছু নেই।

সাধু বলিল,—কিন্তু আমি দেখেছি, এরা দশকে ভালবাসার জন্যে কাজ না করুক,—নিজকে ভালবাসার বা নিজের নামের জন্যে এরা ভাল ভাল কাজ করতে প্রস্তুত থাকে এবং করেও। আমি এদের মধ্যে কাজ করতে পারবো, কারণ, আপনার শিক্ষায় বোধ হয় নামের তীব্র আকাঙ্ক্ষাটা আমি অনেকটা সংযত ক'রে রাখ্‌তে পারবো—বলিয়া সাধু পিতার পদধূলি লইল।

পিতা হাসিমুখে বলিলেন,—তা সময় না হ'লে খুব নিশ্চিত হ'য়ে বলা কঠিন, কে কতটা দেশকে ভালবাসে। ধর, ধীরেন বাবু, কামিনী বাবু—এঁদের নাম ও কাজ দু'টোই সকলের কাছে সুপ্রসিদ্ধ। গ্রামবাসীদের অবিচলিত আস্থা ও নিষ্ঠা এঁদের পরে; এঁরা সহর থেকে এসে যখন কয়েকদিন এখানকার কাজ চালালেন, তখন গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধার আর সীমা রইল না।

সাধু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিল,—তখন আমিও মেসে ব'সে সংবাদপত্রে তাঁদের নাম শুনেছি—প্রশংসা পড়েছি। আমার দেশে ফিরে আস্‌বার ঝোঁক বা স্পৃহা যাই বলেন, সেটাও অনেকটা এই কারণে।

পিতা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন,—এমনই হয় !—ওঁরাই একদিন এসে আমায় বল্‌লেন,—গ্রামের সীমানায় শুঁড়িদের যে মদের আর গাঁজার দোকান আছে, তা উঠে যাওয়া আপনি নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষা করেন ? আমি হাসতে হাসতে বল্‌লাম,—তা কে না করে ? তাঁরা বল্‌লেন,—তবেই দেখুন,—ওটা উঠা চাই-ই। আমরা শুন্‌লাম, আপনি নাকি ওধারে যেতে বিশুকে মানা ক'রে দিয়েছেন ? বল্‌লাম,—তা দিয়েছি, কিন্তু ব'লে দিয়েছি, তোমরা এই ছোট গ্রামের ছেলে, তোমরা ত জান, কা'দের কা'দের বাড়ীর লোক প্রায়ই মদ গাঁজা খায়। তাদের বাড়ী গিয়ে, তাদের যখন মেজাজ ভাল থাক্‌বে, তখন হাতে পায়ে ধরে রোজ রোজ মিনতি করলে নিশ্চয়ই তা'র সুফল হ'বে। দোকানের সাম্‌নে যখন তারা নেশা করবার ঝোঁকে যাবে বা নেশা করে ফির্‌বে, তখন ব'লে অধিকাংশ ক্ষেত্রে—আমার মনে হয়, বিরোধই বাধ্‌বে। ওরা যুবক, ওরা এ বিরোধে সংযত হ'য়ে কাজও যে সুচারুরূপে ক'রে উঠতে পারবে, তাও আমার বিশ্বাস হয় না ; আমি ত বিশুকে আর তার দু'চারজন সঙ্গীকেও চিনি। তাতে কামিনী বাবু উত্তর দিলেন,—তা'ত হ'ল, কিন্তু গ্রামের নাম যে ডোবে, আমাদের আর সহরে মুখ দেখান ভার হ'য়ে উঠ্‌লো। ভেবেছিলাম, আমাদের সেবা-সমিতির কথা সংবাদপত্রের পাতায় জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাক্‌বে ; কিন্তু তা আর হ'বার উপায় নেই। আপনার যা স্কিম, তা'তে পঞ্চাশ বৎসর কাজ করলেও হ'বে না। ওঠ ধীরেন, এঁরা সব সেই মেণ্টালিটির লোক—যাঁরা কাজ চান না, কথা চান।

সাধু অপূর্ব্ব মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল। এতক্ষণে বলিল,—তারপর !

পিতা পুত্রের উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—তারপর আর কি

জ্বলন্ত অক্ষরে বিশুর আর তার সঙ্গীদের নাম সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে বা'র হলো, আর তাঁদেরও মুখ রক্ষা হ'লো। তাঁহারা সহরে চলে গেলেন। সেখানে বড় বড় সমিতির লোকেরা নিশ্চয়ই জানলেন, কামিনী-ধীরেন বাবুর দলের লোকেরাও হাসিমুখে জেল যেতে পারে; এমনই তাদের নেতৃত্বের ক্ষমতা।

এমন সময় সাধুর মাতা আসিয়া জানাইলেন, চরণ আসিয়াছে।

অনন্তবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—টাকা ক'টা টেবিলের ড্রয়ারের ভেতরই রাখলাম না? হাঁ, তুমি গিয়ে দাওগে। তারপর ওয়াল-ক্যালেণ্ডারের দিকে একবার চাহিলেন। মনে মনে বলিলেন—আজ ৪ঠা না?

সাধু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—কি বাবা!

পিতা বলিলেন,—চরণ প্রতি মাসে ১৫৲ টাকা আমার নিকট হ'তে নিয়ে যায়। বিশু আলাদা হ'য়ে গিয়ে অবধি ত আর তাদের সংসার তেমন ভাল ভাবে চলে না। আর চাকুরির টাকা ত তার জেলের সঙ্গেই শেষ হ'য়ে গেছে, তাই আমি আপনা থেকেই এ ব্যবস্থা করেছি। না হ'লে ত—

সাধু বলিল,—কেন, তাদের যা ছিল, ভাগ করলেও ত—

পিতা হাসিয়া বলিলেন,—রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব ছিল—কিন্তু দানের কাছে টাকা আর সময় কতটুকু! সে যে ঐ অতটুকু সেবা-সমিতিকে সব দিয়েছে।—কিছু না হ'বে ত সেই টাকায় আপনার ভাই বোনদের মত অন্ততঃ পঁচিশটী ছোট জাতের ছেলে মেয়েদের সে মানুষ করেছে।

সাধু চুপ করিয়া আরো বহুক্ষণ কথা শুনিল। তারপর স্নান করিতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

দুই দিন পরে।

সন্ধ্যা হইতে দেরী আছে। সাধু গায়ে জামা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কমলার কুঁড়ে ঘরের দিকেই চলিল। পথে আজ তাহার চিন্তার শেষ নাই। চিন্তা তাহার অন্যের জন্য নয়, চিন্তা তাহার নিজের জন্য। সে কি চায়! নাম, যশ, না দেশ ও দশের সেবা! সমাজের কল্যাণ! এমনই আরো কত কি! কাহার প্ররোচনায় সে কাজ করিয়া যায়—বিবেকের—না নেতাদের!—এমনই·········

ইটখোলার মোড় পার হইতেই সাধু দেখিতে পাইল, কমলা খালের ঘাটে বসিয়া নরুর গা ধুইয়া দিতেছে। অপর পারে দুই একজন ব্যক্তি সতৃষ্ণ নয়নে তাহাই নির্লজ্জের মত নিরীক্ষণ করিতেছে। বোধ হয় সেই জন্যই কমলা ইটখোলার দিকে মুখ করিয়া তাহার গা ধুইয়া দিতেছিল। একটু বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, তাহার ঐ গা ধুয়াইয়া দেওয়ার ভিতরে তাহার আন্তরিকতা কত!

কমলা সেই স্থান হইতেই সাধুকে লক্ষ্য করিয়াছিল। নরু কোমরে ছোট ভিজে গামছাখানা জড়াইতে জড়াইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—আপনি একটু দাওয়ায় বসুন, দিদি আস্‌চে, তার গা ধুতে বেশী দেরী হ'বে না— বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে একখানা মোড়া বাহির করিয়া দিয়া সে তেমনই দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

সাধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া তাহাতে উপবেশন করিয়া সম্মুখের দিগন্ত-বিস্তৃত উদার নীলিমার দিকে চাহিয়া পুনরায় কি সব ভাবিতে লাগিল।

কিছু সময় এমনই কাটিয়া গেল। আরো বহুক্ষণ হয় ত কাটিয়া যাইত, কিন্তু চিন্তায় তাহার বাধা পড়িল। কমলা বলিল,—আপনার কষ্ট হ'ল একটু!—আর একটু কষ্ট ক'রে বসুন—বলিয়া জলের ঘড়াটা

একপাশে রাখিয়া তাহার পায়ের কাছে আসিয়া হঠাৎ নমস্কার করিয়া কাপড় ছাড়িতে চলিয়া গেল।

সাধু কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। এমনটা সে আশা করে নাই। কমলা কক্ষের মধ্যে কাপড় ছাড়িবার জন্য চলিয়া গেলে তাহার মনে হইল, তাহার কিছু-যেন একটা বলা উচিত ছিল।

কমলা যখন তাহার সম্মুখে আসিয়া ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিল, তখন তাহার সিক্ত বসন তাহার যৌবনের সৌন্দর্য্যকে ঢাকা-না-ঢাকার আচ্ছাদনে যেন অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়াছিল। তাহার ঋজু অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রত্যেক রেখাটি, নিপুণ, শিল্পীর অস্পষ্ট রেখার মত স্পষ্ট ছিল। নিখুঁত নিটোল সদ্যোধৌত মুখখানির নাতিশ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া, জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছিল! এমন করিয়া যুবতী রমণীকে সে দেখে নাই। দেখিবার প্রয়াস পর্য্যন্ত কখন মনে উঠে নাই। আজ যখন সে অযাচিত ভাবে এমন নিকটে শ্রদ্ধাঞ্জলি লইয়া তাহার পদপ্রান্তে আসিয়া প্রণাম করিল,—তাহাকে সত্যই ক্ষণকালের জন্য সামান্য বিভ্রান্ত করিয়া দিল। কি বলিবে, না বলিবে, ভাবিবার পূর্ব্বেই প্রণাম করিয়া সে বস্ত্র ছাড়িবার জন্য কক্ষে প্রবেশ করিল।

কয়েক মিনিট কেমন ভাবে যেন তাহার কাটিয়া গেল। কমলা একখানি সামান্য মোটা পরিষ্কার কাপড় পরিয়া আসিল। এবং সেখান হইতে নরুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—নরু, ঘরে নাড়ু আছে, খেয়ে পড়তে ব'স, আমি আসচি। তারপর তাহার অ-গোছান চুলগুলি গুছাইতে গুছাইতে সাধুর দিকে ফিরিয়া বলিল,—আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম কিন্তু,—না দিয়ে উপায় নেই, তাই দিলাম।

সাধু বলিল,—বেশ তার জন্যে আর কি? আর এমন কি কষ্ট?

কমলা হাসিয়া বলিল,—তা সত্যি, আপনারা কত কষ্ট সহ্য করেন,

এতে আর এমন কি !—কিন্তু আপনাকে ডেকেছি, আরো কষ্ট দেবার জন্যে ! তার জন্যে আপনাকে প্রস্তুত হ'তে হ'বে।

সাধু একবার চিন্তা করিয়া বলিল,—বেশ আপনি বলুন।

কমলা হাসিয়া বলিল,—বয়সে—সকল বিষয়ে আপনি আমার শ্রদ্ধেয় 'আপনি বলুন' বলবেন না, আমার কেমন লজ্জা করে, বাধ-বাধ ঠেকে।

সাধু সহজেই উত্তর দিল,—বেশ, আর ব'লব না।

কমলা বলিল,—আমি শুনতে পেলাম, আপনি নাকি সমিতির সভ্য হ'য়েছেন। হঠাৎ কেন হ'লেন, আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে।

সাধু বলিল,—এমনি ইচ্ছে হলো, তাই হ'লাম।

কমলা বলিল,—এতদিন হন নি ত ?

সাধু কহিল,—এতদিন আমি এখানে ছিলাম না, তাই হইনি। আর সেজন্যে তোমার কোন কৌতূহলের ত কারণ হ'তে পারে না।

কমলা শেষের কথাগুলির দিকে কোন দৃক্‌পাত না করিয়াই বলিল—কিন্তু যখন কলিকাতায় যান নি, তখন ত হাজার চেষ্টা করাতেও হন নি আপনি।

সাধু বিস্ময়ে একবার তাহার দিকে তাকাইল। এ কথার কোন প্রতিবাদ করিল না। কমলা বলিয়া যাইতে লাগিল,—এই সভ্য না হবার দরুণ বন্ধুকে কত না কষ্ট দিয়েছেন ?—আর কত না কষ্ট নিজেও সহ্য করেছেন ? ভেবে দেখুন দেখি একবার !

সাধু তথাপি কোন উত্তর দিল না। কমলা ক্ষণকাল থামিয়া বলিল,—আমি সেই কথা আজ ভাবচি। বিশুদা বলতেন, সকলকে বশ করা গেল, কেবল তাকে গেল না, অথচ, সে আমারই প্রিয় বন্ধু। আপনার উপর তাঁর যেমন শ্রদ্ধা ছিল, তেমন ভালবাসাও ছিল।

সাধু এতক্ষণে বলিল,—ছিল না, এখনও আছে ? কিন্তু এ সব কথায়

তোমার কি প্রয়োজন, তা বুঝতে পারলাম না।

কমলা ব্যথিত হইয়া বলিল,—না এমন কিছু নেই। তবে আপনি পূর্ব্বে সভ্য হ'লে, আজ তাঁকে আর জেল খাটতে হ'ত না।

সাধু সহজভাবে বলিল,—সে বলা কঠিন কমলা, তাকে যে শক্তি একাজ করতে শিখিয়েছে, তা'র বিরুদ্ধ-শক্তি আমার আছে ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না। তা'কে আমি খুব চিনি! ঠাকুর-মার স্নেহ, বোনের আদর, চরণদার সতর্কতা, আমার বন্ধুত্ব সে শক্তির কাছে তুচ্ছ। দেশের দশের প্রতি তার এমনি একটা জন্মগত যেন টান আছে। বিন্দুমাত্র অন্যায় অবিচার সে সহ্য করতে পারে না।

কমলা ধীরে একটী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—সত্যই না। তাই বলছিলাম, এত তাঁকে বুঝেও যখন সেদিন সভ্য হননি এ সমিতিতে, তখন, এখন আবার হ'তে গেলেন কেন? কা'কে এর ভেতর আদর্শ মনে করলেন?

সাধু বলিল,—কা'কেও আদর্শ করিনি, আর ভাল ভাবে চিনিই বা কা'কে? আদর্শ করেছি,—এই প্রতিষ্ঠানটাকে,—এর উদ্দেশ্যকে।—তুমি বিশুর কাছে আমার কথা শুনতে পেতে বুঝি?

কমলা বলিল,—তিনিই ত আমাকে অপর গ্রাম থেকে এনে এখানে আশ্রয় দিয়েছেন; আমাকে সূতা কাটা ইত্যাদি সব কাজ করতে সাহায্য করেছেন। তাঁর অভাব আজ এই কয়েক মাস ধ'রে বুঝতে পারচি! সেদিন আপনি এসেছেন শুনে আমার যে কি আহ্লাদ হ'য়েছিল, তা আর কি বল্‌বো? যেন এমনই একজন পুরুষের সাহায্য পাবার জন্যে মনে প্রাণে দেবতার কাছে জানাচ্ছিলাম। আপনি একটু বসুন, সন্ধ্যেটা অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে, দিতে ভুলে গেছলাম। দিয়ে আসি।

কমলা চলিয়া গেল। সাধু একটু যেন লজ্জা বোধ করিল। কমলা

সন্ধ্যা দিয়া পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া বসিল।

কমলা বলিল,—বল্লে হয়ত আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, তবুও যা সত্যি, তা আমায় বলতেই হ'বে। আপনার এখানে আসবার আগেও আমার বিশ্বাস ছিল, এ গ্রামে বিশুদার পরে আপনাকেই কেবল সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি। আর এই পারি ব'লেই, আজ এমন নিঃসঙ্কোচে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারচি। অন্য লোক হ'লে—

সাধু বলিল,—কিন্তু শুধু বিশ্বাস আর আলাপ ক'রেই আর তোমাদের রান্নার দেরী করবো না, আজ এখন আসি—আবার কাল না হয় আসবো।

নরু যে কক্ষে পড়িতেছিল, কমলা একবার সেদিকে তাকাইয়া লইল। বলিল,—রান্নার দরকার নেই। রান্না করবার জিনিস নেই।

প্রথম সাধু কথাটা মিথ্যা ভাবিল। পরে কি ভাবিয়া বলিল,—কেন নেই?

কমলা বলিল'—মাসের প্রথম কটা দিন এমনিই থাকে না। আমার কোন কষ্ট হয় না, মুড়ি লঙ্কা দিয়ে কেটে যায়। কিন্তু নরুর জন্যেই কষ্ট হয়। ও বলে,—দিদি, তুমি এত সরু সুতো কাট, তোমার কাছে আর পয়সা নেই। কত মেডেল পেলে, জানি, আমাকে তুমি দু'চোকে দেখতে পার না। আমি বুঝোই—না রে, সত্যি টাকা নেই—যা পাই সামান্য। দেখ, টিনের বাক্স খুলে। সে দেখে বটে, বিশ্বাস করে না।

কমলা যেন আর বলিতে পারিল না। স্থানটা কিছু অন্ধকার, ঠিক বুঝা গেল না, তাহার চোখে জল আসিয়াছে কিনা! কমলা থামিল।

সাধু বলিল,—সমিতি থেকে তোমার না মাসকাবারী বন্দোবস্ত আছে? এমনই ত শুনেছি।

কমলা বলিল,—আগে ১৫৲ টাকা একজনের জন্যে ছিল; বিশুদারা

জেলে যেতে আমাদের দু'জনের জন্যে সাড়ে সাত টাকা বরাদ্দ হ'য়েছে।

সাধু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল,—সাড়ে সাত টাকা দু'জনের জন্যে? কেন এমন হ'লো? কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে তুমি?

কমলা বলিল,—ক'রে লাভ ছিল না, তবু জেনেও একবার করেছিলাম!

সাধু আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—কি উত্তর পেয়েছিলে?

কমলা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বলিল,—এমনই দেশভক্তদের কাছে আমাদের মত কর্ম্মীরা যা পায়!—এখন সমিতির বড় দুঃসময়, সকলকে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হ'বে, অনেক খরচা হ'য়ে যাচ্ছে। এখানে ত কষ্ট স্বীকার করবার জন্যেই এসেছ! এমনি আরো কত কি! তাই জন্যেই জিজ্ঞাসা করছিলাম,—তখন সভা হননি, এখন হঠাৎ হ'লেন কেন? কোন্ আদর্শকে নিয়ে?

সাধু একথার উত্তর দিল না। হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আজ চললাম, আর একদিন আস্‌বো, এখন এই দুই টাকা আমার কাছে আছে, যদি কিছু না মনে করত নাও। বলিতে বলিতে টাকা দুইটা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিবার সময় হাতটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—আর এখন শোধ দেবার চেষ্টা ক'র না।

কথা কয়েকটি উচ্চারণ করিয়াই সে দ্রুত বাহির হইয়া গেল। কমলা মনে মনে বলিল,—এইজন্যেই ত বলেছিলাম আসতে। প্রকাশ্যে বলিল, আপনি দাঁড়ান,—নরু আলোটা দেখা।

নরু আলো আনিতে আনিতে সাধু চলিয়া গেল। নরু কমলার কাছে আসিয়া বলিল,—দিদি, উনি পালালেন কেন অমন ক'রে তুমি বুঝি বকেছ!

কমলা হাসিয়া বলিল,—না রে, এ আর তোর নীরেনবাবু নন্।

অভাব শুনে টাকা দু'টো দিয়ে গেলেন। যদি আবার ফেরত দি, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন।

নরু আলো লইয়া চলিয়া গেল। কমলা কিন্তু সেই অন্ধকারের ভিতর নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেন, তা সে-ই জানে।

এমন গভীর আঁধারে হয়ত কমলা কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিত। কিন্তু হঠাৎ তাহার ধ্যান ভাঙ্গিল। সন্মুখে কালো, একটা বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়া সে অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ করিতে সন্মুখের মূর্ত্তি বলিল,—কে? কমলা, এ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এক্‌লা? নরু আলোটা নিয়ে আয় এ ধারে! এই নাও তোমার টাকাটা—আজ মিটিং সেরে এধার দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম, দিয়ে যাই তোমার টাকাটা; এ আমার পকেট থেকেই দিলাম একরকম, এখনও তোমার টাকা ধনাধ্যক্ষের নিকট হ'তে পাওয়া যায় নি।

কমলা কোন উত্তর না দিয়া হাত বাড়াইল। আগন্তুক দিবার সময় বলিল,—ঐ ত হাতে এখনও টাকা রয়েছে, কোথা পেলে?

নরু পুনরায় আলো লইয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, সে-ই একথার উত্তর দিল। বলিল, সেইযে—যে নতুন বাবুটি আমাদের ওখানে গেছ্‌লেন, তিনিই এই দিয়ে গেলেন।

আগন্তুক ক্রূর হাসি হাসিয়া একবার কমলার দিকে চাহিয়া দেখিল। পরে মুখে সাধারণ হাসি টানিয়া বলিল,—তবে ত আর ভাবনাই নেই, আর দু'দিন বাদে সমিতির একটা টাকাও বোধ হয় তোমার দরকার লাগ্‌বেনা কমলা! জান কমলা! সাধু দাতা, ধনী। আর তোমায় সে দান কর্‌তে পেলে ধন্যও হ'য়ে যাবে।

কমলা কোন কথা কহিল না। একবার তাহার ইচ্ছা হইল, সেই পাঁচটা টাকা সজোরে ছুড়িয়া তাহার মুখের উপর মারে! আজ হয় ত

মারিত ; কিন্তু এমন সময় দুর্গাশঙ্কর বাড়ীতে প্রবেশ করিল। কমলা তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, —দুর্গা, তোমার এত আজ দেরী হ'ল যে ?

সে হাতের লাঠি ও পায়ের খড়মটা রাখিতে রাখিতে বলিল,—আজ ত জানি ঘরে কিছু নেই,—তাই মুদীর কাছে মিনতি ক'রে কিছু—জান মা, মুদী বলে যে, —মেজবাবু মানা ক'রে—

কমলা কঠোর স্বরে বলিল,—দুর্গা, এনেছ ত আগে দাও, রান্না হোক,—হ'য়েছে, বেশ রাখা হ'য়েছে। সে কথা চাপা দিবার জন্য তাহাকে ধমক দিল।

ধমক খাইয়া দুর্গা সেদিকে ফিরিতেই সমিতির মেজবাবুর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। দুর্গা চমকিয়া উঠিল। আগন্তুকের মুখ কালীবর্ণ হইয়া গেল। ক্ষণকাল আর অপেক্ষা না-করিয়া মেজবাবু চলিয়া গেল। সেই পাঁচটা টাকা ছুড়িয়া মারিলেও বোধ হয়, তাহার মুখ এত মসীময় হইয়া যাইত না।

কমলা একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া রান্নাঘরে রাঁধিতে চলিয়া গেল। নরু দুর্গাশঙ্করের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল, তারপর স্বর একটু টানিয়া অথচ নিম্নস্বরে বলিল,—এঁ্যা, কি করলে দুর্গা-দা ! কাল কি হ'বে দেখ্‌বে'খন ! বাবা, মেজবাবু কারুর খাতির রাখে না।

নরুর কথায় কোন ভরসা না পাইয়া সে উচ্চস্বরে বলিল,—কি বল মা ? আমি ত আর মিথ্যে বলিনি, সত্যিই বলেছি। তা'তে অত ভয়টা কি !—না হয়, চাক্‌রিটা যাবে। এর বেশী ত আর নয়, হোলী আস্‌চে দেশে যাব, বস্‌ !

নরু তাহাকে আরো ভয় দেখাইয়া বলিল, ও দেশে যেতেই হ'বে। দেখো আমি বলে দিচ্ছি!

দুর্গা রাগিয়া বলিল, আচ্ছা তাই হ'বে—তাই হ'বে দেখ্‌বো

তোদের কে আগ্‌লাতে আসে? আমি আছি ব'লেই, তাই তোমাদের এতদিন এখানে বাস্ করা হ'চ্ছে; আমার যদি টাকার লোভ থাক্‌তো নরে ত দেখতিস্ কি হ'তো! কত ধার থেকে কত টাকার লোভ এসেছে তুই কি বুঝবি! ভারি আমায় টাকার লোভ দেখাচ্ছিস, এটা মনে রাখিস, আমি চরণের দাদা। চাক্‌রীর ভয় নেই।

নরু বলিল,—তুমি বুঝি আরো বড় বড় চাক্‌রি পেয়েছিলে, তা নাও নি? ভুল করেছ—কাল একটা জোগাড় করো।

কমলা সব শুনিতেছিল, ডাকিল,—নরু এধারে এস! কোন কথা কয় না আর; দুর্গা, তোমায় কে ছাড়ায়,—কে কি করিবে? তারা জানে তুমি আর কেউ নয়, চরণের দাদা।

ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। গ্রীষ্মের জমাট-বাধা মেঘগুলি আজ জমিয়া আকাশটাকে শুভ্রবর্ণে বিবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। দম্‌কা উতলা হাওয়া মাঝে মাঝে মানুষের মনে এক অভিনব শিহরণের সুর আনিয়া দিতেছে। এমনি-একটা মেঘ-গলিয়া-পড়া বৈকালে সাধু কমলার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কমলা সাধুকে দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে বলিল,—ক'দিন ধ'রে আপনার আগমনই আমি প্রতীক্ষা করছিলাম! তারপর নরুর দিকে চাহিয়া বলিল,—দেখলি নরু, আমার কথা সত্যি কি তোর কথা সত্যি?

সাধু এসকল কথার কোন উত্তর না দিয়া সেই মোড়াটা আজ নিজেই টানিয়া লইয়া বসিল এবং হাসিয়া বলিল,—কিন্তু কেন আমার প্রতীক্ষা করছিলে?

কমলা হাসিয়া কি-একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় সাধু

পুনরায় বলিল,—কিন্তু অমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা ত ঠিক হবে না, তোমার সঙ্গে আজ আমার অনেক কথা আছে।

কমলা একবার সাধুর দিকে সহাস্যে চাহিল, তারপর রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া কি-একটা কাজ সারিয়া সার সম্মুখে বঁটী আর আনাজ লইয়া কুটিতে বসিল।

তারপর কমলা বলিল,—আমি ভেবেছিলাম, আপনার কাছে আমারই অনেক কথা আছে; কিন্তু আপনি বল্লেন উল্টো। তবে বলুন, আপনি আগে, আমি না হয় শেষেই বল্বো।

সাধু এসব কথায় তেমন-কোন কর্ণপাত না করিয়া বলিল,—দুর্গাশঙ্কর তোমার এখানে থাক্তো কতদিন ধ'রে?

কমলা একটু চিন্তা করিয়া উত্তর করিল,—তা দেখ্তে দেখ্তে একবৎসর ত হ'বেই! কেন?

সাধু বলিল,—সে যদি চলে যায়, তুমি একা থাক্তে পারবে এখানে?

কমলা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—আপনার ত একটা বিবেচনা-বোধ আছে, তা কি করে পারি? তা হ'লে আপনি শুনেছেন সব?

সাধু বলিল,—কিছু শুনিনি, তবে চরণের কাছে শুনলাম, দুর্গাশঙ্কর নাকি নীরেনবাবুর নামে কি সব মিথ্যে বলেছে, সেইজন্যে তার দণ্ড হ'য়েছে।

কমলা একবার সাধুর দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিল,—মিথ্যে বলেছে? তা হ'বে।

সাধু বলিল,—দুর্গার সঙ্গে নীরেনের সঙ্গে যা সম্বন্ধ, তা'তে এমন কি কথা আছে, যা মিথ্যে বল্লে তা'র এত মানহানি হ'বে যে একজন দ্বারবানকে এত তাড়াতাড়ি তার তাড়াতে হ'বে। সেই ভাবছি।

কমলা কিছুক্ষণ একথার কোন উত্তর দিল না। তারপর বলিল,—আছে নিশ্চয়ই, না হ'লে তা'কে ছাড়ান এতো প্রয়োজনই বা হ'লো কেন?

সাধু বলিল,—কিন্তু কি সে কথা তাইত ভাবি। সমিতির টাকাকড়ি সম্বন্ধে,—তাও ত বলে সন্দেহ হয় না, এ বিষয়ে তার সুখ্যাতিও আছে, তবে?

কমলা সাধুকে তাহার সেদিনের সকল কথা বলিল। সাধু চলিয়া গেলে নীরেন আসিয়াছিল। তাহার হাতে টাকা দেখিয়া সে কি বলিয়াছিল, তারপর পর দুর্গাশঙ্কর কি অন্যমনস্কভাবে বলিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর সমিতির একটা গুপ্ত সভায় তাহার ভাগ্যের সম্বন্ধে কি বিচার হইয়াছে, তাহাও বলিল। যেসকল গুপ্ত সংবাদ সে নরু আর আর দু'একজন সভ্যার নিকট হইতে পাইয়াছে, তাহা সে তাহার সম্মুখে ব্যক্ত করিল।

সাধু তন্ময় হইয়া, বিস্মিত হইয়া সকল ব্যাপার নীরবে শ্রবণ করিল। সে সেই অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার শ্রবণ করিয়া কি বলিবে, কি করিবে, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। কমলার কথা এদিক দিয়া সে কোন সময়ে তেমন ভাবে নাই। কমলা তাহার জীবনের করুণ কাহিনী, যখন একে একে বর্ণনা করিয়া যাইতেছিল, তখন তাহার অন্তর ব্যথায় অশ্রুতে ভরিয়া গিয়াছিল। সাধু ভাবিল,—সত্যই ত নারী-জীবনের এই অধ্যায়টা সকলের অপেক্ষা সঙ্গীন। তাহার কামনা বাসনাময় এ বয়স! তাহার অভিভাবকশূন্য এ অবস্থা! সে কাহার হাতে নিশ্চিন্তে, পরম নির্ভয়ে আপনাকে তুলিয়া দিবে! তুলিয়া দিবারই বা সঙ্গী কোথা! যদিও সঙ্গী হইবার বাসনা কাহারও থাকে, তাহার পথ!

নরু আসিল। কমলা নয়ন দুইটী মুছিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল এবং

খিচুড়ী চড়াইয়া দিল। সাধু কিছুক্ষণ ভাবিল, তারপর নরুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—নরু তোমায় ওঁরা মেরেছেন। ছিঃ, তুমি কেন বলনি, আমি সেদিন এসেছিলাম, অনেকক্ষণ কথাও বলেছি কমলার সঙ্গে। মিথ্যে কথা বলতে নেই! কালও যদি জিজ্ঞাসা করেন ত বল্‌বে, তিনি এসেছিলেন, অনেকক্ষণ ছিলেন, ভয় কি তোমার!

নরু মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—একবার রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল,—ওঁরা আপনাকে দেখে নেবেন বলেছে।

সাধু তাহার অহেতুক আশঙ্কা দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনার স্বরে বলিল,—ভয় নেই নরু, ওরা মিছামিছি বলেছে,—ভয় দেখাবার জন্যে। আমার উপর ওদের কেন রাগ হ'বে!

নরু একটু আশ্বস্ত হইল। সাধু বলিল,—তুমি একলা তোমার দিদিকে নিয়ে এখানে থাক্‌তে পারবে—যদি দুর্গাশঙ্কর চ'লে যায়?

নরু সংক্ষেপে উত্তর করিল,—না। আপনি জানেন না, ওঁরা ভাল লোক নন। আমি ওঁদের অনেক কথা শুনেছি। ঐ ঘরে ব'সে ব'সেই মাঝে মাঝে ওঁরা বলাবলি করেন যে!

কমলা নিকটে আসিয়া বলিল,—থাক্, আর সে সব কথা বল্‌তে হ'বে না, যাও পড়গে; খিচুড়ি হ'লেই ডাক্‌বো আমি।

নরু বিমর্ষ মুখে চলিয়া গেল।

বৃষ্টি একটু চাপিয়া আসিল।

কমলা আকাশের পানে চাহিয়া বলিল,—এখন আর থাম্‌বে ব'লে ত বোধ হয় না। আপনার যেতে ভারি কষ্ট হ'বে।

সাধু সংক্ষেপে উত্তর করিল,—তা হো'ক। এ ত আর মানুষের সত্যকারের কষ্ট নয় যে যার জন্যে ভেবে সারা হ'তে হ'বে। এ ব্যথা

আজ আছে, কাল নেই, কিন্তু মানুষের এমন সত্যকারের ব্যথা আছে, যা চিরকালের! বহুদিন তার কষ্ট বহন ক'রে এমনই ঝড় জলের ভেতর দিয়ে যেতে হ'বে।

কমলা চুপ করিয়া রহিল! কোন কথা কহিল না। সাধুও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—কিন্তু আমি ভাবছি, কেমন ক'রে তুমি থাক্‌বে এখানে একা-একা, দুর্গাশঙ্কর যখন চ'লে যাবে?

কমলা সহজস্বরে বলিল,—কিন্তু আমার ত তবু দুর্গাশঙ্কর আছে, আপনি আছেন, বিশুদা' ছিল। কিন্তু যাদের এসব কেউ নেই, কেবল আছে তাদের আমার মত বয়স ও বাসনা—তাদের কথা কি কোন দিন ভেবেছেন? ভেবে দেখুন, আমায় অভাবে ফেলে আমার মুক্তি কেড়ে নেবার এঁদের কি চমৎকার ফন্দি! আপনি কি ভাবছেন জানি না, এঁদের সঙ্গে মিশে, এখানে এই সমিতিতে এসে, সত্যই আমি ভালো হ'য়ে গেছি। কিন্তু আজ যদি মার কাছে থাকতাম, তা হ'লে আমার দশা যে কি হ'তো, তা বলে ফেলা কঠিন!

সাধু বলিল,—তোমরা নিজেরা রোজগার ক'রে খাবে, এ নিন্দা আমরা বরাবর ক'রে এসেছি। কিন্তু আমি আজ ভাবচি—যার জন্যে নিন্দা ক'রে এসেছি, তার কি পথ রুদ্ধ ক'রে আস্‌তে আজ পর্য্যন্ত পেরেছি? না ঠিকএই কারণে এই পথেই তাদের নাবিয়ে দিয়ে এসেছি!

কমলা সাধুকে এ চিন্তা হইতে মুক্তি দিয়া বলিল,—একদিন আমি এখানে এসেছিলুম কত আশা নিয়ে,—সত্যই বিশুদা'র কথা যখন আমি শুন্‌তাম, তখন ভাবতাম, আমার দ্বারাও দেশের সেবা হ'বে, পল্লীরমণীর নাম, যশ হ'বে। সে ছিল আমার কত সুখ, তাঁর কথায় আমার ছিল অগাধ বিশ্বাস। তিনিই ছিলেন আমার একান্ত নির্ভর। তাঁকে হারিয়ে—মাত্র এই ক'দিন হারিয়ে আমি আমার জীবনটাকে অসহ্য ব'লে বোধ

করচি! মনে করুন, আপনি কে! আপনাকে দু'দিন আগে এক রকম দেখিনি, কি ক'রে আপনাকে আমার মনের কথা, বুকের ব্যথা বলচি, কি ক'রে আমার লজ্জাসম্ভ্রম হারালাম আপনার কাছে? কি ক'রে বিশ্বাস এলো আপনার 'পরে? অন্য লোক হ'লে পারতাম এমন ক'রে বিশ্বাস করতে?—না এমন সব কথা লজ্জাহীনার মত বলতে?

সাধু তাহার মুখের পানে চাহিতে লজ্জা বোধ করিল, মাথা নত করিল। কমলা বলিয়া যাইতে লাগিল,—সে কেবল আমি বিশুদা'কে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি ব'লে। তিনি আপনাকে দেবতা ব'লে—প্রাণের বন্ধু ব'লে মনে করতেন।

কমলা সমিতির সকল বিষয়েই যশ অর্জ্জন করিয়াছে। মহিলা-বিভাগের সকল কাজই সে প্রাণ দিয়া করে এবং তাহার জন্য সমিতি গৌরবও কম লাভ করে নাই। কিন্তু তাহার ভিতর যে এত ভাব ও ভাষা বর্ত্তমান ছিল, তাহা সমিতির কেহই একপ্রকার জানিত না। সেদিকের বিকাশের পথ বোধ হয় সমিতিতে খোলা ছিল না।

কমলা কাহার কন্যা! কেমন করিয়া আসিল! কেন হেথা আসিল! তাহার ইতিহাস সাধু জানে না, জানিবার উপায় তাহার কাছে খুবই কঠিন। বিশু ফিরিয়া আসিলে যদি কোনদিন সে জানিতে পারে, পিতা আজ বলি-বলি করিয়াও বলিলেন না। জানিবার তাহার প্রয়োজনও এমন ছিল না। কিন্তু আজিকার কথায়, সাহসে তাহার প্রাণে তাহার পরিচয় জানিবার বাসনা ক্ষণকালের জন্য হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া নিমেষে মিলাইয়া গেল।

কমলা পূর্ব্বের কথার সূত্র ধরিয়া বলিল,—একদিন তাঁকে বলেছিলাম কথায় কথায় যে,—বিশুদা', আপনি আমায় যা স্নেহ করেন, বিশ্বাস করেন, তা'তে মনে হয়, পৃথিবীতে কেবল একমাত্র আপনাকেই

বিশ্বাস ক'রে আমার জীবন-যাত্রা চালিয়ে দিতে পারবো। তা'তে তিনি বলেছিলেন,—আমার এক বন্ধু আছে তার নাম সাধু; কিন্তু শুধু নাম নয়—আমি শপথ ক'রে বলতে পারি, তা'কে বিশ্বাস ক'রে কেউ এ জগতে ঠকবে না। তার কাছে সব কথা—সব জীবনটা এমনই দিয়ে দিতে পারতে। আমাকে আর নরুকে যেদিন এখানে তিনি আনলেন, সেদিন আপনাকে দেখাতে পারলেন না ব'লে, তাঁর সেকি আপশোষ। সকলে যখন তাঁকে নিন্দা করছেন, তিনি কেবল ব'লেছেন, আপনি থাকলে কেবল সুখ্যাতি করতেন, তাঁকে ভালবাসতেন।

সাধু একবার ভাবিল—আজ কমলার কি হইল! ব্যথায় যখন প্রিয়জনের কথা হয়, তখন মানুষ কি এমনই হয়! বিশুর কারাদণ্ড হওয়ার পর কাহারও সহিত সে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে পারে নাই। তাহার কথা কাহারও কাছে বলিবার এমন সুযোগও হইয়া উঠে নাই। তাই আজ তাহার ঘরে-বাহিরের ভারাক্রান্ত জীবন সে সাধুর কাছে উন্মুখ করিয়া দিয়া তৃপ্তিলাভ করিবে, এই যেন তাহার পণ, এই যেন তাহার মুক্তি!

সাধু কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কেন তাকে নিন্দা করছিল সকলে?

কমলা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—আমাকে তিনি সঙ্গে নিয়ে এ গ্রামে এসেছিলেন ব'লে?

সাধু বলিল,—তোমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ কোথা হয়?

—জহরপুরে যখন দুর্ভিক্ষ আর তার সঙ্গে আত্যাচার হয়, তখন তিনি সেখানে অন্ন-বস্ত্র দিয়ে সেবা শুশ্রূষা করতে গেছলেন। গ্রামের একপ্রান্তে আমাদের বাস ছিল। আমরা একঘরে ছিলাম কিনা!

—একঘরে কেন?—লজ্জা হয় ত ব'লে দরকার নেই।

—না, লজ্জা কি? আর ক'রেই বা লাভ কি—আর যখন আমার লজ্জার ভার বিশুদার অবর্ত্তমানে আপনাকে রক্ষা করতে হ'বে, তখন তা ক'রেই বা আমার লাভ।—আমি খুব ভাল বংশেরই মেয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যেবার দুর্ব্বৃত্তদের ভীষণ অত্যাচার হয়, সেবার আমার বিধবা মার সব লুট হয়ে গেল। ধন-মান সব। গ্রামের লোকেরা ঠিক করলে, আমাদের সব গেছে। ভদ্র-পাড়ায় আমাদের, আর দু'একজন যাদের আমাদের মতই দশা হ'য়েছিল, তাদের বাস উঠ্‌লো সেদিন থেকে। তারপরও আমার মার উপর কম অত্যাচার হয়নি। একদিন যখন তিনি আহত অবস্থায় শুয়ে, তখন এঁদের সঙ্গে দেখা। মা দুঃখ করে অনেক বিশুদাকে বলেছিলেন; তা' শুনে লাভ নেই আপনার।

কি ভাবিয়া কমলা কিছুক্ষণের জন্য নীরব হইল। তারপর সাধুর দিকে একবার অপলক নেত্রে চাহিল। হঠাৎ বলিয়া বসিল,—আপনি আমার বিয়ে দিয়ে দিতে পারেন?—সত্যি বল্‌চি; যা ব'লে দিব্যি কর্‌তে বল্‌বেন বল্‌বো।

সাধু কোন একটা কথাও স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না; কি করিবে তাহাও উপস্থিত ঠিক করিতে পারিল না। যদি সে ইহা উপন্যাসে পড়িত, তাহাও বিশ্বাস করিত না। এমন নির্লজ্জের মত কথা সে যে একজন কমলার মত মেয়ের মুখে শুনিতে পারে, তাহা সে কেন, কেহই আশা করিত না।

সাধুর অপূর্ব্ব বিস্ময়ের ভাব দেখিয়া কমলা সত্যি ব্যথিত হইল। বলিল,—আপনাকে আমি কখন ছলনা করিতে পারি? এ বিশ্বাস কেমন ক'রে আপনার এলো? সত্যি আমি আজ নিজকে অসহায়া ব'লে মনে করচি বলেই একথা বলচি। মহিলা-বিভাগের সম্পাদিকা সুধীরা বসুকেও বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন আমার এই বয়সে

বিবাহ করা প্রয়োজন। কিন্তু বিবাহ করে কে!

সাধু বহু কষ্টে নিজকে সংবরণ করে বলিল,—মানুষ যাকে ভালবাসে তাকেই—

কমলা তাহার কথা শেষ না করিতে দিয়া বলিল,—তা'কেই বিবাহ করতে চায়, তা'কেই পেতে চায় জানি; কিন্তু এদেশে ত তা পাবার উপায় নেই, পাওয়া উচিতও নয়; এখানের যে বিবাহ আগে, তারপর ভালবাসা। এসব কথা এত পুরাতন যে আপনার কাছে এ কথা আজ বলতে হ'লো বলে, আমারও লজ্জা হ'চ্ছে। বলুন দুর্গাশঙ্করের যাবার আগে আমার একটা সম্পূর্ণ নির্ভরের স্থান আপনি করে দিবেন?—বলিয়া আজ কমলা সাধুর হাতখানা টানিয়া নিজের হাতের মধ্যে পূরিল।

সাধু অবাধ মেলামেশা প্রভৃতি বহু সামাজিক সমস্যা লইয়া মেসে বসিয়া তর্ক করিয়াছে, অনেকে তাহার সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হইয়াছে। কিন্তু সমস্যা যে এমন ভাবে তাহার জীবনে মূর্ত্তিমান্ হইয়া একদিন দেখা দেবে, তাহা তাহার কল্পনার অতীত ছিল।

সাধু ধীরে ধীরে হাতখানা খুলিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়া বলিল,—আজ তোমার কি হ'য়েছে কমলা, তা তুমিই জান, কিন্তু এ সব—

এমন সময় কাহার পদশব্দ শোনা গেল। দেখিতে দেখিতে দুইটি মূর্ত্তি আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। সাধু তাহার হাতখানা তাহার মুঠার ভিতর থেকে খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; কমলা নির্ম্মম কঠোর হইয়া ধরিয়া রহিল। সাধু ঘামিয়া আকুল হইল।

নীরেন কমলাকে একখানা পত্র দিতে আসিয়াছিল। সাধুকে সে স্থানে তদবস্থায় দেখিয়া বলিল,—এই যে আপনিও এখানে। আপনার বাড়ীতে গেছ্‌লাম দেখা পাই নি; পরে বলুবো'খন আপনার সঙ্গে কি কি প্রয়োজন। এখানে যে জন্যে এসেছি, তা' ব'লে যাই।

কমলা সাধুর হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া পত্রখানি বাঁ-হাতে মুড়িয়া লইয়া চুপ করিয়া রহিল। নারেন হঠাৎ অত্যন্ত ভদ্র হইয়া বলিল,—কমলা, তুমি পল্লী-সেবা-সমিতির মেয়ে। তোমাদের কাজে—চরিত্রে পল্লীর মঙ্গল হ'বে এই আশাই আমরা রাখি। এজন্যই আমাদের এ সমিতি গঠিত হ'য়েছে। সাধারণ সম্পাদক হিসাবেও আমি তোমায় বল্‌চি, আর মহিলা-বিভাগের সহকারী সভানেত্রীও বলেছেন ঐ পত্রে যে, সভা কতিপয় সভ্যার নৈতিক চরিত্র-সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াতে আমাদের কার্য্যকরী কমিটি আজ হইতে স্থির করিয়াছেন যে, কোন বেতনপ্রাপ্তা সভ্যা, সম্পাদক বা সহঃ সভানেত্রীর অনুমতি ব্যতীত যে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ বা দেখা শোনা করিতে পারিবে না। এই সমিতি মনে করেন, এই নিয়মানুবর্ত্তিনী হইলে সভ্যাগণের নৈতিক চরিত্রের বা অন্য কোন গর্হিত কার্য্যের সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোনরূপ আশঙ্কা থাকিবে না।

কমলা কঠোর হইয়া বলিল,—পত্রে এই লেখা আছে? আজ যে এ পত্র আস্‌বে, তা পূর্ব্ব হ'তেই আমি জান্‌তাম। কালকের মিটিংয়ের কথা আমি শুনেছি। তবে পত্র আর প'ড়ে কি হ'বে? বলিয়া কমলা তাহাদের সম্মুখে পত্রখানি ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিল এবং দুই পায়ে মাড়াইয়া বলিল,—আমার নাম আপনার সমিতিতে গিয়ে আজই কেটে দিন, আমরা সহকারী সভানেত্রীর বা সম্পাদকের দাসী বাঁদী নয় যে, তাঁরা যা হুকুম করবেন, অন্যায় হ'লেও তা শুন্‌বো। যান আপনারা এখান থেকে, এ বিশুদা'র টাকায় দেওয়া বাড়ী, এ সমিতির নয়। তিনি যখন বল্‌বেন তখন দেখা যাবে।—বেতন!

কমলা উত্তেজনায় যাহা করিয়া বসিল, তাহা সত্যই অভাবনীয়। নারীর চরিত্র লইয়া খেলা করায় যে হঠাৎ এমন বিপদ আসিবে, তাহা

সম্পাদক ভাবে নাই। কথা কয়টা বলিয়া সে দ্রুতপদে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া সেই স্থান হইতেই উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—সাধুবাবু, আপনি একটু দাঁড়াবেন! আপনার সঙ্গে কথা বাকি আছে।

নীরেন ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মত থাকিয়া বলিল,—জাত সাপের ছা' কি না! আচ্ছা!

কথা কয়টি কমলা শুনিতে পাইল কিনা বলা কঠিন, সাধু শুনিতে পাইল, কিন্তু একটি কথাও বলিল না।

যাহারা মাথা উঁচু করিয়া আসিয়াছিল, তাহারা মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল।

সাধু সেইখানে কাঠের পুতুলের মত কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি করিবে, কি বলিবে, তাহা তাহার বুদ্ধিমান মস্তকে ঢুকিল না।

কমলা রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল, খিচুড়ী ধরিয়া গিয়াছে। কমলা কাঁদিতে বসিল। বাহিরে যে একজন তাহারই অনুরোধে অপেক্ষা করিতেছে, তাহা সে ভুলিয়া গেল।

বিশু চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বারাণ্ডায় খালের দিকে আসিয়া বসিয়া আছে, ভাবিতেছে,—চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রাচীর। এ ব্যূহের ভিতরে প্রবেশের মন্ত্র অনেকেই জানে, কিন্তু বাহির হইবার পথ রুদ্ধ; তাহা কর্ম্মকর্ত্তার ইচ্ছাধীন। কে সে, যে বাহির হইবার পথ জানে! মুক্তিহারা মানব, মুক্তিকামী মানব, বারে বারে শত সহস্রবার এমন করিয়া বাঁধনের ভিতর মুক্তির সুধা পান করিবার প্রয়াস পাইয়াছে! সবই কি ব্যর্থ?

এমন সময় বিকাশ 'চয়নিকা' হইতে একটী পদ্য আবৃত্তি করিতে করিতে তথায় আসিল।

> দুর্দ্দিনের অশ্রুধারা মস্তকে পড়িবে ঝরি তারি মাঝে
> যাব অভিসারে জীবনসর্ব্বস্ব ধন অর্পিয়াছি যারে
> জন্ম জন্ম ধরি! কে সে? জানি না কে!
> শুধু জানি যে শুনেছে তাহার আহ্বান গীত
> নির্য্যাতন লয়েছে সে বুকপাতি
> মৃত্যুর গর্জ্জন শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।

বিশু কান পাতিয়া শুনিল। পরে বলিল,—সুন্দর!—জানি না কে!

বিকাশ হাসিয়া বলিল,—সুন্দর না হ'লে কি অসুন্দরের পূজা করি!

বিশু বলিল,—এও কি তোমার 'চয়নিকা' থেকে বলচ, না নিজের?

বিকাশ উত্তর করিল,—নিজের না, ঐ ভাণ্ডার থেকেই। এখানে ব'সে ব'সে কি চিন্তা করা হ'চ্ছে? কারার মানুষগুলো বন্ধ হয়ে আছে, আর ঐ মানুষগুলো বেশ মুক্ত, না? মানুষ এমনই ভাবে। কিন্তু মুক্তি দু'জনারই এক।

বিশু অনুযোগের স্বরে বলিল,—কিন্তু তা' আমি ভাবচিনি; তোমার কবি-প্রাণ, নিজের কবিতা নিয়েই আছ! আমি ভাবচি, এই বাস্তব জগতের কথা।

বিকাশ বলিল,—তুমি কি মনে কর, কবিরা বাস্তব জগতের কথা ভাবে না?—আমি ত ভাবি তারাই ভাবে সঠিক ক'রে। তোমায় ছ'মাস ধ'রে পড়িয়ে পড়িয়ে এ ধারণা ঘোচাতে পারলাম না! কবিরা বাস্তবের কথাই লেখে, আর যে কবি তা' লেখে না, সে কবি নয়, সে লোভী।

বিশু বলিল,—আজ সাধুর আর একখানা পত্র পেয়েছি, এই দেখ। বলিয়া তাহার হাতে সেই পত্রখানি সে দিল। বিকাশ পড়িতে লাগিল,—ভাই,

সেদিন পত্রে সমিতির কথা খুলে লিখেছি। আজ তোমার বাড়ীর বিষয়-সংক্রান্ত কথা লিখ্‌চি। তোমার সেজ কাকীমার কথা বিশ্বাস ক'রে প্রেস আর সেই পড়ো জমিটা ওদেরই প্রাপ্য ব'লে পঞ্চ মোড়ল রায় দিয়েছেন। সেজ কাকীমা তাঁর ছোট ছেলের মাথায় হাত দিয়ে যখন শপথ করে, তখন হারানী আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু বিচারের মুখে তা' গ্রাহ্য হ'লো না। কারণ হারানী চাকরানী, আর অন্যজন কুলবধূ। মিথ্যা কথা তা সে যত বড়ই হোক, এদেশে সতীত্বের উপর দাগ কাটতে পারে না। তাই একজন সতীত্বের জোরে ভয়ঙ্কর মিথ্যা বল্‌লে, অত্যন্ত নিঃসহায়দের সব নিলে কেড়ে, তা' সহ্য হ'লো না। কিন্তু একজন অসতী অত্যন্ত সত্য কথা ব'লে একজন নিরুপায়কে বাঁচাতে গেল, তা' সহ্য হ'লো না। অতএব বাড়ীর উঠানে তোমার প্রাচীর উঠ্‌লো; যা তোমার জেলের প্রাচীরের চেয়েও কম সুদৃঢ় নয়!

নিরুপায় চরণ আর লতি খুব কেঁদেছিল। বলেছিল, তুমি এলে তবে বিচার যেন হয়; কিন্তু তারা গ্রাহ্য করেনি তা'দের আবেদন। তোমার দিকে বলার জন্যে হারানীকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে। সে এখন কমলার বাড়ী থাকে। শাপে বর হ'য়েছে। তুমি ভে'ব না, এসে সব দেখ্‌বে। ভালবাসা নিও। ফিরে এসে একবারে একটা কষ্ট পাবে ব'লে এসব জানালাম। ইতি—

তোমারই

সাধু।

পত্র পাঠ করিয়া বিকাশ হাসিয়া বলিল,—বিশে কি মজা! যে লোক সকলকে আপনার করবার মন্ত্র নিয়ে পথে বেরুল, সারা গ্রামখানা

একটা মস্ত পরিবার হ'বে এই যার কল্পনা, তার বাড়ীতে আগে উঠলো ভেদের প্রাচীর! তারই আত্মীয় হ'ল অনাত্মীয় আগে! আশ্চর্য্য! যে নিজের বিশ্ব পরকে উজাড় ক'রে দিতে চায়, তার সম্পত্তি এমন নিজের স্বার্থের জন্যে চুরি করে কেন? মানুষ এত দাতা, এত স্বার্থপর কেন?

বিশু তাহার সব কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল; কিন্তু শেষের কথা বুঝিতে না পারিয়া বলিল,—ঐ শেষে অমনি একটু কবিতা র'য়ে গেল।

—কেন? বুঝতে পার্‌লে না? তুমি দাতা, আর তারা স্বার্থপর! কবিতা কিছুই নয়, সব খাঁটী গদ্য; কিন্তু ওটা পদ্য হ'লে কি হ'ত শুন্‌বে?—

স্বার্থপর মানবের দল, বারে বারে মুক্তিরে সে পরায়ে শৃঙ্খল—
নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডী দিয়ে হীন সুখে আপনারে রাখে অচঞ্চল।
দাতা তা'র পাশে আসি—

বিশু হাসিয়া বলিল,—তুমি থাম, আমি বুঝেছি, সত্যি বল্‌চি, এ ক'মাসে আমায় তুমি যা জ্ঞান দিয়েছ, তা আমি ব'লে—

বিকাশ তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিল,—দেখনা ভেবে, এটা শুধু তুমি বল্‌তে ও কবির কল্পনা। কিন্তু ভাই, কল্পনা যে তোমাকে আমাকেই নিয়ে। তা' না হ'লে তোমার অত ভাল লাগবে কেন? ভূতের গল্প ছোট বয়সেই ভাল লাগে, কিন্তু মানুষের গল্প মানুষের পরিণত বয়সে লাগে ভালো।

—অনেকের ভূতের গল্পও ত বড় বয়সে ভাল লাগে!

—তা লাগে, কিন্তু তারা বয়সে বড় বটে, কিন্তু মানুষ হিসাবে ছোট!

বিশু ওকথা ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—আচ্ছা আমরা কিজন্যে এখানে এলাম? এখানে এসেও যদি তাদের চৈতন্য না হয়, তবে আর উপায়

কি? ধিক্, নীরেনের এমন ব্যবহার পাব, তা আমি আশা করিনি। সহকারী সভানেত্রী, আমাদের সভাপতিরও সেই দশা! কেউ গ্রামের মঙ্গল চায় না! চায় নিজের মঙ্গল! চায় নিজের কর্ত্তৃত্ব! আজ দলাদলি মেটাতে গিয়ে দেখছি, আরো দলাদলি বেড়েছে। আজ বুঝতে পারছি, তারা দেশকে ভালবাসেন। নিজেকে ভালবাসে। নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-কর্ত্তৃত্ব মেটাবার জন্যে এই সেবা-সমিতির সাহায্য নিয়েচে মাত্র। আজ ভাবছি, কেন এলাম এখানে—এখানেও ত সেই দলাদলি!

বিকাশ তাহার অন্তরের বেদনা অনুভব করিয়া বলিল,—আমরা এখানে কেন এলাম—জান না? একজন তাঁর যশের প্রদীপ উজ্জ্বল করবার জন্যে আমাদের সাম্‌নে ধরেছিল। আমরা তার তেল যোগান দিয়েছি মাত্র। বেশী কিছু করতে পেরেছি ব'লে আমার মনে হয় না। আর দলদলির কথা যা বলচো, তা বহুদিন থাক্‌বে। দরিদ্রের প্রচুর সম্পত্তি নিয়ে ভাগ কিনা! কোথায় যেন পড়েছি—দাস কর্ত্তৃত্ব পেলে, সে সকলকে নানান রকমে দাসই করতে চায়।

অবিনাশ বাবু কখন যে তাহাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা তাহাদের দুই বন্ধু কেহই জানিতে পারে নাই। তিনি এতক্ষণ পরে বলিলেন,—দলাদলি থাক্‌বে। সুরাসুরেও দলাদলি ছিল। দেখ বিকাশ, তোমার আছে ভাষা, ওর আছে প্রাণ।

—না, অবিনাশ বাবু, আমার মনে হয়, প্রাণ থাক্‌লেই ভাষা খোলে।

অবিনাশ বাবু হাসিলেন মাত্র, জবাব দিলেন না।

বিশু বলিল,—যাদের বিশ্বাস ক'রে আমরা এখানে এলাম, তারা এমন করবে তা' আমি ভাবিনি! যাদের ভেবেছিলাম কি মহান্, আজ

দেখ্‌ছি তারা কি ছোট! মানুষ যে সব আকাঙ্ক্ষা বাসনা নিয়ে ক্ষুদ্র হয়, তারাও তাই হ'য়েছে। কেবল তাদের আচরণ অন্য এই যা! একদিন সাধুকে বলেছিলাম,—এ সমিতির তুমি সভ্য হও, আজ গিয়ে বলতে হ'বে, তুমি ছেড়ে দাও। কোন সম্বন্ধ আমি আর রাখ্‌চিনি গিয়ে। পঞ্চায়ৎ—সালিশী—নৈতিক চরিত্রের অজুহাত!

অবিনাশ বাবু সেদিনকার পত্রের বিষয় কিছু জানিতেন, কিন্তু আজিকার বিষয় জানিতেন না। তখনই বিকাশের নিকট হইতে শুনিতে লাগিলেন। বিশু অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। দূরে পুলটার দিকে সে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সে বলিল,—গিয়ে সব তাড়াব! দেখি কি হয়!

অবিনাশ বাবু বলিলেন,—এখন তাদের তাড়াতে হ'লে—সহজে হ'বে না। একটা বড় দল করতে হ'বে। যে দলের কথায় ভয় পাচ্ছিলে, সেই দল করতে হ'বে। তবে তাড়ান যাবে! এখানে শুধু প্রাণ দিলে হ'বে না, তোমার পক্ষে বেশী হাত তোলার লোক জোগাড় করতে হবে। এ অন্য জগৎ বিশু!

বিশু এতদিন সভা-সমিতি করিয়াছে, এত খোঁজ তাহার রাখিতে হয় নাই। তাহার দ্বারা যথেষ্ট কাজ পাওয়া যায়, তাহাকে রাখিতেই হইবে, তজ্জন্য সে সব বিষয়ে সমিতিতে বরাবরই স্থান পাইয়া আসিয়াছে। আজ বিশুকে কিন্তু অন্য জগতের কথা ভাবিতে হইল।

অবিনাশ বাবু আরো অনেক উপদেশ দিলেন। পরে বলিলেন,—আর ক'দিন পরে ত চ'লে যাবে তোমরা—গিয়ে সব বুঝে কাজ করো। তোমাদের যখন ষাণ্মাসিক অধিবেশন হবে, তখন আমি বোধ হয় বাহিরেই থাক্‌বো, আমায় জানিও, আমি যাব। তোমাদের গ্রামে আমি আগে দু'একবার গেছি।

বিশু আহ্লাদের আতিশয্যে বলিয়া উঠিল,—আপনি যাবেন ?—বেশ হয় তা' হলে।

ছোট গ্রামখানির ষ্টেশনে আজ ভীড় হইয়াছে। একদিকে সমিতির সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যূঁই ফুলের মালা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মালাগুলি মহিলা-বিভাগের কর্ম্মীরা গাঁথিয়া দিয়াছেন। বাহিরে দুইখানি গাড়ীও অপেক্ষা করিতেছে। প্ল্যাট্‌ফরমের একপ্রান্তে চরণ আর সাধু সতৃষ্ণনয়নে সুদূর রেলের লাইনের দিকে চাহিয়া আছে।

কিন্তু ষ্টেশনের আয়োজনের অপেক্ষা সমিতির বাড়ীর আয়োজন আরো সুন্দর। সেখানে সহকারী সভাপতি মহাশয় ও মহিলা-বিভাগের সভানেত্রী মহাশয়া তাহাদের আদর-অভ্যর্থনার জন্য বসিয়া আছেন। কার্য্যতালিকা এইরূপ প্রস্তুত হইয়াছে যে, ঐ চারিজন আসিলে প্রথমে এখানে একটী বালিকাদের গান হইবে, পরে কিছু জলযোগ করিয়া সকলের একখানি গ্রুপ ফটো তোলা হইবে! তবে মনে মনে অনেকটা এ-অভিসন্ধিও আছে যে, সে চিত্রখানি কলিকাতার কোন একখানি সংবাদপত্রে ছাপাইবার জন্য পাঠাইতে হইবে। অবশ্য তলায় লেখা থাকিবে,—অমুক গ্রামের পল্লী-সেবা-সমিতির ত্যাগী কর্ম্মীবৃন্দ—ইত্যাদি।

যাহা হউক নয়টা পঞ্চান্ন মিনিটে এই ক্ষুদ্র গ্রামের ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে, তাহাতে চারজন রাজকুমার আসিবে। তাহারা নাকি কোন্ সুদূরে গিয়াছিল—এক ঘুমন্ত রাজকুমারীকে জাগাইতে। আজ তাহারা

দেশে ফিরিতেছে, তাই এত আয়োজন! যদিও সঙ্গে তাহাদের অর্দ্ধেক রাজত্বও নাই, রাজকুমারীও নাই।

নির্দ্ধারিত সময়ের দুই মিনিট পরে গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে লাগিল। জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কতজন কত প্রকারের আনন্দধ্বনি উচ্চারণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের জন্য একটা উৎসব বাধিয়া গেল।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিল তিনজন। তাহাদের গলায় মালা জড়াইয়া দিবার সময় নীরেন, হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল,—বিশু কোথা?

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল,—বিশুদা' শেষের গাড়ীতে আছে। এ-গাড়ীতে সে কিছুতেই আস্‌তে চাইল না।

অতএব, সেই ক্ষুদ্র জনতা গাড়ীর শেষের দিকেই ফিরিল। সকলে দেখিল, চরণ বিশুকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে, আর কাঁদিতেছে।

দৃশ্যটি করুণ; কিন্তু অতি মনোরম। আজ আর চরণ ভৃত্য নয়, বিশু প্রভু নয়। পুত্র বিদেশ হইতে বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া চলিয়া আসিলে স্নেহময় পিতা যেমন আনন্দাশ্রু ফেলে, তাহাকে কোলে পাইবার জন্য সাপটিয়া ধরে, এ যেন তেমনই।

চরণ আকুলকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—বল ভাই, আর এমন ক'রে আমাদের ছেড়ে যাবে না! কষ্ট দেবে না!

বিশু হাসিয়া উত্তর দিল,—না চরণদা, না, তোমাদের ছেড়ে গিয়ে আমি ভারী অন্যায় করেছি। আমায় ছাড়, ওরা আস্‌চে!

নীরেন একগাল হাসি হাসিয়া তাহার কণ্ঠে মালা দিতে গেল। বিশু গম্ভীর মুখে তাহার দিকে একবার তাকাইয়া মালা-গাছটি রেলের লাইনে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। একখানি মালগাড়ী তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেল।

নীরেনের অত্যন্ত রাগ হইল, কিন্তু সে বাহিরে প্রকাশ করিল না। ধীরে ধীরে বলিল,—চল গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, একবার সেবাসমিতির অফিসে যেতে হ'বে, ওঁরা ব'সে আছেন।

বিশু বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—ও গাড়ীতে কি এদের দুজনেরও স্থান হ'বে?—আমি এখন যেতে পারবো না। আগে আমায় বাড়ী যেতে হবে।

হেমন্ত বলিল,—ওখানে একটু ফটো তোলার—জলযোগের বন্দোবস্ত হয়েছে।

বিশু বলিল,—তাই নাকি! তা বেশ! তোমাদের মধ্যে যারা ফটো তোলাতে চাও, তারা তোলোগে! আমি মনে করি, আমার ফটো তোমাদের মধ্যে না থাকাই ভালো। চরণ, চল, সাধু, সঙ্গে আয়! আমরা হেঁটে বাড়ী যাচ্ছি। আমার নমস্কার জানিও তোমাদের সমিতিকে!—বলিয়া আর কোনরূপ কথা না কহিয়া বিশু চরণ ও সাধুর সহিত চলিয়া গেল।

নীরেন একবার কি ভাবিল, তাহার হাসিমুখ নিমেষে কালী হইয়া গেল। এত লোকের সম্মুখে বিশু যে তাহাকে এমন অপমান করিবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

যাহারা কিছুই জানিত না, তাহারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। চরণ সাধু ও বিশুকে লইয়া হাঁটিয়া চলিল।

নিমেষে সকল উৎসব কেমন-যেন-একটা খাপছাড়া ভাবে পরিণত হইয়া গেল।

কমলার চুলের রাশি বাঁধিতে বাঁধিতে হারানী বলিল,—তোমার চুল

নয় ত, যেন জাবাকুসুমের বিজ্ঞাপন। কি ক'রে জাড়িয়ে জড়িয়ে থাক।

কমলা কোন উত্তর দিল না, কেবল একটু ম্লান হাসিল। হারানী কোন উত্তর না পাইয়া বলিল,—আচ্ছা, বিশুবাবু আসা অবধি অমন মুখ গম্ভীর ক'রে থাক কেন বল দেখি। আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারি না। সত্যি, রোজই তোমায় বল্‌বো বল্‌বো ভাবি, বলা আর হয় না।

কমলা কোন উত্তর দিল না। হারানী বলিল,—প্রায়ই দেখি, যখন তিনি কথা কইতে আসেন, তখনও তোমার মুখ গম্ভীর-বিষণ্ণ, আর যখন কথা ক'য়ে চলে যান, তখনও তেমন। বুঝ্‌তে পারি না।

কমলা এবার কথা বলিল,—যতক্ষণ তিনি থাকেন, ততক্ষণ আমার ভেতর দ্বন্দ্ব হয়। আমি নিজেকে যেন বিব্রত মনে করি।

হারানী নির্নিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে যেন তীব্র দৃষ্টির দ্বারা তাহার অন্তঃস্থল দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হারানী বহুদিন এখানে আসিয়াছে। যেদিন পঞ্চায়েতের দ্বারা বিশুদের বিষয় ভাগ হইয়া গিয়াছে, তাহার পরদিন হইতে এখানে তাহার স্থান হইয়াছে। তদবধি সে কমলার সহিত ধসবাস করিয়া বহুকথা জানিয়াছে এবং বহুকথা সেও বলিয়াছে। কিন্তু আজ যে কথা সে জানিবার চেষ্টা করিয়াছে, একথা সে এতদিন জানিতে চাহে নাই।

হারানী বলিল,—কেন এমন হয়? বিশুদাদা বাবুকে আমি ছোট বেলা থেকে দেখে আস্‌ছি, তিনি অতি সুন্দর, গরিবদের মা-বাপ।

কমলা বলিল,—তা কি আর জানি না দিদি! আমাকে যে স্থান থেকে তুলে এনেছেন, সে অমন ছেলেই পারে। আর হয়ত পারতেন সাধুবাবু।

হারানী বলিল,—না, তিনি পারতেন না। তবে তাঁকে দেখে অত বিমর্ষ ভাব তোমার কেন হয়?

কমলা বলিল,—আমার জন্যে তাঁ'র কত সহ্য করতে হয় জানো? আমার জন্যে তাঁ'র সংসার হ'লো আলাদা। আমার জন্যে তাঁকে সমিতি হয়ত ছাড়্‌তে হ'বে! আমার জন্যে তাঁর লাঞ্ছনা গঞ্জনা সবই ভোগ করিতে হয়। অথচ সব চেয়ে আমার বড় দুঃখ ঐ যে, আমায় ছেড়ে চ'লে যাবার পথও তাঁর নেই। আমার বয়সই আমাকে সকলের চক্ষে কাল ক'রেছে। কিছুক্ষণ থামিয়া বলিল,—একদিন ভেবেছিলাম, এই যে সূক্ষ্ম সূতা কাটতে পারি, কাপড়ে নানান রকম কাজ করতে পারি, সেলাই করতে পারি, লেখাপড়া করতে পারি, লোকের সেবা করতে পারি, এতেই বোধ হয় আমার জন্ম সার্থক হ'য়ে যাবে। সকলেই বোধ হয় আদর ক'রে স্থান দেবে। সেই আশায়ই আমি এসব কাজে এমন ক'রে প্রাণ দিয়েছি। কোন দিনই আমি ভাবতে পারিনি, আমি কোন গৃহলক্ষ্মীর চেয়ে কোন অংশে নীচু। কিন্তু জন্ম-অপরাধে আজ আমার সর্ব্ব কর্ম্ম-সাধনা পণ্ড হ'য়ে গেছে। আজ বড় হ'য়েছি, সব বুঝতে পারি। যতই মেডেল পাই, যতই দেশভক্তদের কাছ হ'তে বাহবা পাই, ওসব ভুয়া। কাজের সময় সবার কাছে আমি নীচু ব'লেই প্রতিপন্ন হই।

কথাটা সত্যই হারানীর অন্তরে বিঁধিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,—তা যা বলেছ। আমি একদিন এসেছিলাম এমনই একটা পণ নিয়ে। মনে করেছিলাম, গৃহস্থ বাড়ীর সতীলক্ষ্মীদের যদি ক'দিনও সেবা করতে পাই, তবে বুঝি আমি ধন্য হ'য়ে যাব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে এমন একজনের হাতে এসে পড়লাম যে আমার সাধনাও পণ্ড হ'ল। চরণ বড় বৌদির কথা বলত, তা'ত আমার ভাগ্যে হ'ল না।

কমলা চিন্তিতমুখে বলিল,—আজ আমি কি করি তাই ভাব্‌চি। যাকে আমি ভালবাসি, আমার জন্যে সবাই তাকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিচ্চে

দেখবো, তা আমি প্রাণ ধ'রে সহ্য করতে পারবো না।

হারানী বলিল,—তা কি পারা যায়! কমলা, সত্যি করে বল কা'কে ভালবেসেছ?

কমলা ম্লানমুখে বলিল,—শুনে লাভ কি হারানী, তবে শুনে রাখ, আমি যাকে ভালবেসেছি, তাকে না ভালবেসে আমার উপায় ছিল না।

হারানী বলিল,—সে জানে যে তুমি তাকে ভালবাস?

কমলা হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—ঠিক মতে ভালবাসলে, না বল্‌লেও কিছু জানা যায়। চরণদা'কে তুমি ভালবাস তা চরণদা জানে। সাধুবাবুকে বিশুদা ভালবাসেন, তাও সাধুবাবু জানেন। তবে কোন্ সব ভালবাসা জানা যায় না জান? যেমন সেদিন অস্পৃশ্য জাত নিয়ে একটা সভা হ'লো, তাতে নীরেনবাবুর বক্তৃতা শুনে কে বিশ্বাস করবে যে, তিনি আমাকে বলেছেন যে আমি জাতসাপের মেয়ে। এসব ভালবাসা বোঝা যায় না।

হারানী সেদিনকার ঘটনার সকল কথাই শুনিয়াছিল। হারানী হাসিয়া বলিল,—আমি যখন সহরে থাকতাম, তখন একবার কোথায় বন্যা হ'য়েছিল, আমরা গান গেয়ে অনেক টাকা তুলে দিয়েছিলাম; কি সুখ্যাতি সংবাদপত্রে! কিন্তু বন্যার জল শুকিয়ে গেল। আমাদের দ্বারা তাদের কাজও ফুরিয়ে গেল। তারপর বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় লিখ্‌লেন যে, যারা বারবনিতাদের নিয়ে উপকার করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু তাদের সংস্রবে আর যেন তাঁরা কোন কর্ম্মানুষ্ঠান না করেন। তা'তে ভালর চেয়ে মন্দ অধিক হ'বে। আশঙ্কা হয়ত অনেক ক্ষেত্রে সত্যও হ'তে পারে! কিন্তু আমাদের সম্পাদিকা সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন,—আর না একাজে। যারা আমাদের

এ-হীন কাজে নাবিয়েছে, তারা অধিকাংশই পুরুষ, একথা ত তারা প্রমাণ করতে চায় না।

কমলা তাহার কথা শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া হাসিল। একদিন সাধুবাবুকে বলেছিলাম, আমার একটা বিয়ে দিতে পারেন?

হারানী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—তুমি বলেছিলে, লজ্জা করে নি?

কমলা বলিল,—তখন আমার অবস্থা লজ্জার বাহিরে। তখন ঘরে বাহিরে স্নেহে-ভালবাসায় আমি বিপন্ন। তাকেই বিশ্বাস করতাম, তাকেই ব'লে ফেলেছিলাম। তখন আমার বয়সকে পুরুষের হাত হ'তে পাহারা দেবার জন্যে নিযুক্ত ছিলো, নরু আর দুর্গাশঙ্কর। এখন যে কাজে তুমি আমার পাশে আছ। একি আমার লজ্জার বাহিরে নয়!

হারানী কোন কথা বলিল না। চুল বাঁধা শেষ করিল এবং দুইজনে মিলিয়া গা ধুইতে চলিয়া গেল।

এখন এ বাড়ীতে থাকে এই দুইটী প্রাণী। নরু ছোট হইলেও সে পুরুষ, সেই জন্য এখানে সে থাকিতে পায় না। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন এবং মিটিংএও পাশ হইয়া গিয়াছে যে, মহিলা-বিভাগে কোন পুরুষের সংস্রব থাকিতে পারিবে না। তদবধি নরু আলাদা থাকে। যদিও নরুর ও-ব্যবস্থায় আপত্তি ছিল, কমলারও ছিল। কিন্তু উপায় নাই! নরুর ব্যবধান প্রতিরাত্রেই কমলাকে ব্যথা দেয়! কোথাকার কোন্ অজানা মুসলমানের ছেলে, তাহাকে সেই যে দিদি বলিয়া ডাকিত, তাহা সে আজও ভুলিতে পারে নাই; ভুলিতে পারিবে কিনা তাও সন্দেহ।

রাত্রে কমলা আর হারানী পাশাপাশি শুইয়াছে। হারানী অনেকক্ষণ একথা-সেকথা কহিয়া বলিল,—আচ্ছা তুমি যে বললে না

ভালবেসে উপায় নেই, তাই ভালবেসেছি। এর মানে কি ?

কমলা কি উত্তর দিবে একবার ভাবিল। তারপর বলিল,—যদি কোন লোক তোমার সুখ-দুঃখের ভাগী হয় দিদি, তোমার অসহায় জীবনের বিশ্বাসের একমাত্র পাত্র হয়, যদি তিনি তোমাকে বিপদ আপদ থেকে বাঁচাবার জন্য নিজের সমস্ত প্রিয়বস্তু ত্যাগ করেন, তা হ'লে তুমি তাকে কি না-ভালবেসে থাক্‌তে পার ?

হারানী চুপ করিয়া রহিল। কমলা আবার বলিল,—আমি চেয়েছিলাম, আজও চাই। আমাকে কোন সৎলোক বিবাহ করুক, আমি ভাল হই। না হ'লে আমার জীবন নিয়ে, যৌবন নিয়ে পুরুষে এমন ছিনিমিনি খেল্‌বে—তাদের বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন কর্‌বে। শেষে ছোট ছেলেরা যেমন আমের আঁটীর শাঁসাল রস চুষে তাকে নর্দ্দমায় ফেলে দেয়, আমাকে তাই দেবে। সেটা মেয়েমানুষ হ'য়ে পছন্দও করবো না কোনদিন, আর ভাগ্য ব'লে মেনেও নেব না। আমার মায়ের জীবনের ইতিহাস থেকে তার বিড়ম্বনার স্বাদ আমি পেয়েছি।

হারানী নীরবে শুনিতে লাগিল, কথার মধ্যে বাধা দিল না। এ ত তাহারও সমস্যা। সেও ত একদিন একজনকে ভালবাসিয়াছিল, তাহার জন্য, নিজকে ভাল করিবার জন্য, সে একদিন গৃহস্থের বাড়ীতে দাসীত্ব স্বীকার করিতেও আসিয়াছিল। কিন্তু—

সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই, তথাপি দুজনে যে তাহারা জাগিয়া আছে, তাহাও পরস্পরে বুঝিতে পারিতেছে।

ঘড়িতে একটা বাজিল। রাত্রি নিস্তব্ধ।

কমলা হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া লণ্ঠনের আলো জোর করিয়া একটা প্যাঁটরা টানিয়া বাহির করিল এবং তাহা খুলিয়া হারানীকে

দেখাইল। বলিল,—দেখ দিদি, আমি কত প্রেমপত্র পেয়েছি, কত উপহার পেয়েছি। এসব পত্রের উত্তরে আমি কেবল বলেছিলাম, আমি বিবাহ করতে চাই। তা'তে কোন উত্তর আসেনি। অথচ এই সব পুরুষ সমিতির নৈতিক আবহাওয়া কলুষিত হ'বে ব'লে ভয়ে অস্থির! আমার জন্যে তাদেরই সমিতিকে নূতন নিয়ম জারী করতে হ'লো।

ছারানী পত্র দুই-খানা পাঠ করিল। অপর পত্রগুলি স্পর্শ করিল না। আবার তাহারা নিজের শয্যায় শয়ন করিল। একটি কথাও তাহারা বহুক্ষণ বলিল না। অনেকক্ষণ কাটিল।

রাত্রি তিনটা বাজিল।

ছারানী বলিল,—এদের মধ্যে একজনও যদি তোমায় বিবাহ করতে চাইত, তা'হ'লে কি করতে?

কমলা অম্লানবদনে বলিল,—বিবাহ করতাম!

—কিন্তু তাদের ত তুমি ভালবাস না।

—তা'তে কি, বিবাহ করলেই যে ভালবাসতে হয়, এদেশে এর কোন মানে নেই;—বয়স হ'লেই বিবাহ করতে হ'বে! তা'হলে সব দিক বজায় থাকবে এই ত আমি বুঝি। বৌ'দের কোন দিন ওজন করে দেখেছ! তারা কত সের ভালবাসে তাদের স্বামীকে! বিবাহ করলেই সতী হওয়া সাজে।

ছারানী অবাক্ হইয়া গেল তাহার কথায়। এত কথা সে শিখিল কোথা হইতে! সে গৃহস্থ বধূদের সহিত মিশিলই বা কোথা হইতে! এমনই নানান চিন্তায়, নিজেদের জীবনধারার প্রশ্নে, তাহারা রাত্রি কাটাইতে লাগিল। আজ তাহাদের জন্মাষ্টমী।

ছারানী একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—যাকে ভালবাস, তাকে কি কোন দিন বিবাহ করতে বলেছ?

কমলা হাসিয়া বলিল,—না, কারণ আমার বিশ্বাস হয়ত তিনি বিবাহ ক'রেই বসবেন—এমনই তাঁর উদার প্রাণ, কিন্তু তাঁর ব্যথা লাগ্‌বে, যখন আমার জন্যে তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে ছাড়তে হ'বে, সকল নিন্দা মাথায় বরণ করতে হ'বে। সেটা আমি সহ্য করতে পারবো না।

হারানী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তা সত্যি, ভালবাসলে তাকে আর কষ্ট দিতে—নীচু করতে ইচ্ছে যায় না। আমিও পারিনি কমলা, সে যে কি, তা তোমার কথায় আমি বুঝতে পারি। তিনি বলেছিলেন একদিন, আমরা এদেশের পুরুষ মুক্তিহারা—কিন্তু তোমারা মুক্তিহারার চেয়েও অনেক কিছু-হারা। কথাটা ভাল ক'রে তখন বুঝিনি, তিনি যা বলতেন শুনে যেতাম, যেটা অনেকবার বলতেন, সেটা মনে থাক্‌তো। আজ তার অনেক মানেই মনে হ'চ্ছে।

তারপর সহসা আবেগভরে হারানী কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল,—কাকে তুমি ভালবাস? আমায় বলতে লজ্জা কি?—বিশুবাবুকে? না?

কমলা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিল,—হাঁ।

রাত্রি ভোর হইয়া গেল। দূরে কুক্কুটের কণ্ঠস্বর দাঁড়কাকের কর্কশ আওয়াজ শুনা যাইতে লাগিল।

অপর একদিন।

সকালের পাঠ সারা হইয়া গিয়াছে। হারানী একমনে কমলার কাজ দেখিতেছে। তাহারই হাতে-কাটা অতি মিহিসূতার একখানা কাপড়ে সে কাজ করিতেছে। কেমন সুন্দর লতাপাতা আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে! পাতা ও লতার সহজ স্বাভাবিক গতির দিকে লক্ষ্য করিয়া

হারানী মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া আছে।

কিছুক্ষণ এমনভাবে কাটিয়া গেল। কমলা মুখ তুলিয়া একবার হারানীর দিকে চাহিয়া সে লাল সূতার কাজ রাখিয়া পুনরায় সবুজ সূতার কাজ ধরিল।

হারানী এই অবসরে বলিল,—এত কাজ ক'রে হ'বে কি ? সবগুলো যদি গাদা করে' বাক্সবন্দী ক'রেই রাখবে, তবে আর কি হ'বে ?

কমলা কাজ করিতে করিতেই বলিল,- সব কাজের ফল আশা করতে নেই। অসময়ে কাজে লাগ্‌তেও পারে। আর কতদিন এমনভাবে পরের পয়সায় খেয়ে মানুষ হ'ব ? মানুষের লজ্জাও ত আছে ?

হারানী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল,—সত্যই।

কমলা পাতার ডগাটা করিতে করিতে বলিল,—তখন সমিতির কাজ করা লজ্জা ছিল না; কিন্তু এখন এমনভাবে থাক্‌তে লজ্জা করে। আর জ্ঞান ত হ'চ্ছে দিন দিন !

. হারানী কথায় সায় দিয়া বলিল,—তা আর নয় ?

কমলা কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময়ে সাধু আর বিশু আসিয়া তাহাদের কুটীরে প্রবেশ করিল। তাহারা সমিতির ষাণ্মাসিক উৎসবের অনুষ্ঠানের জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল, সেইজন্য কিছুদিন এদিকে আসিতে পারে নাই; আজ একটু বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছে। তাহারা দুইজন সমিতিকে ঢালিয়া সাজিবে বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছে। ভোট সংগ্রহ করিতে, সাধারণ ব্যক্তিগণকে সমিতির উদ্দেশ্য এবং তাহার ভিতর যে সব গলদ জমিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিতেই এই কয়দিন কাটিয়াছে।

এখানে আসিয়াই বিশু বুঝিতে পারিল, এই কয়েকদিনের মধ্যে সময় করিয়া একবারও অন্ততঃ এখানে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন না থাকুক,

উচিত ছিল। কারণ এগ্রামে কমলার শত্রুর ত অভাব নাই। একা হারানীর ভরসায় রাখিয়া যাওয়া তাহার উচিত হয় নাই।

বিশু সামান্য ইতস্তত করিয়া বলিল,—কমলা, পরশু আমাদের সমিতির প্রদর্শনী খোলা হ'বে, তোমার জন্যে খানিকটা আলাদা স্থান খালি রাখ্‌তে ব'লে দিয়েছি।

কমলা মুখ তুলিয়া বলিল,—কেন?

—তোমার হাতের কাজ, চরকা কাটা, এসব দেখাবার জন্যে। আর তোমায় সভাপতির অভিভাষণের পূর্ব্বে একটা আবৃত্তি করতে হ'বে। সেই—সেই কবিতাটা।

কমলা বিরক্ত হইয়া বলিল,—আমার শরীর খারাপ, আমি যেতেও পারবো না, আর প্রদর্শনীতে আমি আমার কোন কাজও দিতে পারবো না।

সাধু হাসিয়া বলিল,—এ আপনার রাগের কথা, শরীর খারাপের জন্যে হাতের কাজ দিতে পারবেন না, এ যেন কেমন শোনাল না?

বিশু সামান্য হাল্‌কা স্বরে বলিল,—আর শরীর খারাপই বা কোথা? বেশ ত কাপড়ে ফুল-লতা-পাতা তোলা হচ্ছে! দেখ কমলা, তোমায় বারবার বলেছি, মিথ্যে কথা ব'ল না, আমি প্রাণ গেলেও বলি না, তা' জান ত?

কমলা সহজভাবেই বলিল,—তা জানি! কিন্তু শরীর খারাপটা নিয়ে না হয় কথা হ'তে পারে, কিন্তু আমি যে যাব না আর পাঠাব না, এটা ত বোঝা গেল। এটাই আমি সত্য বল্‌তে চেষ্টা করেছি।

—বেশ, কিন্তু কেন এত রাগ? সে সমিতি আর থাক্‌বে না, আমরা দুজনেই সে ব্যবস্থা করতে বেরিয়েছি। যা'তে যেতে তোমার রাগ হ'বে না, আর হওয়া উচিতও নয়।

—তা যেন হ'লো ধ'রে নিলাম, কিন্তু এসব কাজ দেখিয়ে, চরকায় সুতো কেটে, আবৃত্তি ক'রে কি হ'বে?

—কি আশ্চর্য্য কমলা, এতে কি হ'বে বল্‌চো? এ দেশের কাজ, দশের কাজ, লোকে প্রশংসা করবে। তোমায় দেখে সকলে শিক্ষা করবে, আমাদের সমিতির গৌরব হ'বে, গ্রামের নাম হ'বে—কি বলচো?

বিশু ভাবের বশে কত কি বলিয়া গেল। আরো কত কি হয়ত বলিয়া যাইত। কিন্তু কমলা কথার মাঝেই বলিল,—তা'তে আমার লাভ কি, আমিও দশের মধ্যে একজন ত?

—নিশ্চয়ই, তুমি পুরস্কার পাবে, মেডেল পাবে. যশ পাবে, মান পাবে আর কি!

—তা'তে আমার লাভ?

—লাভ!

—তা'তে আপনাদের লাভ আছে, আমার কি?

হঠাৎ বিশু কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার উত্তেজনার ভাবটা কিছু কমিয়া আসিলে, বলিল,—দেশের কাজ হ'বে—তোমায় দেখে—

কমলা বিরক্ত ও কঠোর হইয়া বলিল,—তা'তে আমার কি হবে?

সাধু চুপ করিয়া শুনিতেছিল। কোন কথার উত্তর দেয় নাই। সাধুর দিকে একবার বিশু চাহিল। কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না দেখিয়া তাহার কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত ধীর করিয়া বলিল,—আমি যে তাদের কথা দিয়েছি, তাদের তা হ'লে—

—কেন দিলেন?

—আমার মনে হ'য়েছিল, তোমার কোন আপত্তি হ'বে না।

—কেমন ক'রে মনে হ'য়েছিল আপনার?

—এমনই।

—এমনই না, ভেবেছিলেন আপনারা যে, যখন তাকে আশ্রয় দিয়েছি, তখন আর আমাদের কথা সে অমান্য করবে না। কেমন না?

—হয় ত এমনই ভাব আমাদের মনে অজান্তে বদ্ধ ছিল। একথা মিথ্যা নাও হ'তে পারে। সাধু স্পষ্ট করিয়া এই কথা কয়টা বলিল।

বিশু অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

কমলা হাসিয়া বলিল,—বেশ, তবে যখন আপনারা কথা দিয়েছেন, তখন আমি যেতে বাধ্য বা যাবও; কিন্তু মনে রাখবেন,—দেশের কাজ ব'লে যাচ্চি নি। আর আবৃত্তির বেহায়াপানা আমার দ্বারা হ'বে না ব'লে দিলাম—বলিয়া হাতে কাজ লইয়া সে ঘরে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সাধু ও বিশু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল।

হারানী কেবল ভাবিয়া পাইল না, যে কেন আজ কমলা ইহাদের প্রতি এত কঠোর হইল। অথচ এই সেদিন সে শুনিয়াছে, ইহাদের সে ভালবাসে, ভক্তি করে। সে নীরবে তথায় বসিয়া রহিল।

যাইবার সময় বিশু হারানীকে বলিল,—নিতিনদের বাহিরের ঘরে আমার একজন অতিথি আসবেন; কাল তুমি যেন তার আগে গিয়ে একবার পরিষ্কার ক'রে রেখ ঘরখানা। তারা সব অনেকদিন বিদেশে গেছে, শরীর শোধরাতে। ঘরখানা নিশ্চয়ই অপরিষ্কার হ'য়েই আছে। যে ক'দিন তিনি থাকেন, সময় ক'রে একবার একবার পরিষ্কার ক'রেও আসবে। লতি আর চরণের জ্বর না হ'লে তোমায় বল্‌তে হ'তো না।—কি জানি তুমিও যদি কমলার মত রাগ কর!

হারানী লজ্জিত হইয়া বলিল,—তা'তে আর কি, আজই দুপুরে গিয়ে পরিষ্কার ক'রে রেখে আস্‌বো'খন।

বিশু তাহার হাতে চাবি দিয়া চলিয়া গেল এবং একটী চাবি নিজের কাছে রাখিয়া দিল। তারপর ম্লানমুখে দুই বন্ধুতে তথা হইতে চলিয়া গেল।

অবিনাশবাবু আজ সহর হইতে আসিলেন। প্রদর্শনীর উদ্বোধন কার্য্য সমাধা করিবার জন্য তাঁহার নিমন্ত্রণ। নিতিনদের বাহির কক্ষে তক্তাপোষে শুইয়া তাঁহার ক্লান্ত শরীরটাকে একটু বিশ্রাম দিতেছেন।

হারানী গা ধুইয়া ফিরিতেছিল। সে আশা করে নাই, আজ এখনিই অতিথি আসিয়া পড়িবেন। নিকটে আসিয়া দেখিল, দরজা খোলা। ঘরে একজন ভদ্রব্যক্তি শয়ন করিয়া আছেন। সে গাত্রবস্ত্র সংযত করিয়া লইয়া পানীয় জল কলসে ভরিয়া দিবার জন্যে কক্ষে প্রবেশ করিল।

কলসে জল ভরিয়া দিয়া যখন সে উঠিতে যাইবে, দেখিল, অতিথি বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন।

হারানী আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। অস্ফুটস্বরে বলিল,—বিজয়বাবু?

অবিনাশবাবু, হাসিয়া বলিলেন,—আমি বিজয়বাবু না—আমি এখানে অবিনাশবাবু, সরলা!

হারানীও হাসিয়া উত্তর করিল,—আমিও এখানে হারানী—সরলা নয়।

—তোমাতে আমাতে অনেক মিল দেখ্‌চি!—বলিয়া তিনি সামান্য হাসিলেন।

—দেখ্‌তে পাওয়া যায় না—এমন অনেক মিলও আছে—বলিয়া হারানীও হাসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

তারপর সরলা কেমন করিয়া হারানী হইল এবং বিশুদের বাড়ীতে কর্ম্ম লইয়া কেমন করিয়া আসিল এবং কেমন করিয়া আপাততঃ তাঁহার কাটিতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ তাঁহার কাছে দাখিল করিল।

অবিনাশবাবু সকল ব্যাপার শুনিয়া একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলিলেন। হারানী তাহা জানিতে পারিল না।

অবিনাশবাবু কহিলেন,—সরলা, আজ যাও, ভিজে কাপড় নিয়ে বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'র না, অসুখ হ'বে।

হারানী বলিল,—তা' হয় ত হ'বে, কিন্তু তা'তে তত কষ্ট নেই, আপনার সঙ্গে দেখা হয় ত হ'বে না আর জীবনে। কোথায় উধাও হ'য়ে যাবেন, তার ত কোন ঠিক নেই। তার চেয়ে একটু দেখে কথা ক'য়ে নি আপনার সঙ্গে।

অবিনাশবাবু হাসিয়া বলিলেন,—কোথায় আবার যাব? যখনই মনে করবে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে। আর এ চারদিন ত এখানেই আছি! যাক, একটা ভাবনা কেটে গেল আমার, তোমার হাতে যখন অতিথি-সেবার ভার, তখন আমি নিশ্চিন্ত। না, আর না, যাও কাপড় ছেড়ে এসগে।

হারানী হাসিয়া বলিল,—এ আর আমার বাড়ী না, এখানে কাপড় ছেড়ে এসে আপনার সঙ্গে গল্প করতে দেখ্‌লে, আপনাকে আর প্রদর্শনী খুলতে দেবে না এরা। এখানে বড় কড়া নজর!

অবিনাশবাবু হাসিয়া বলিলেন,—তাই বুঝি তুমি ভিজে কাপড়ে কথা কইচ? কেউ এসে পড়লেও কোন দোষ থাক্‌বে না। আচ্ছা বুদ্ধি তোমার হ'য়েছে, তুমি আমার দলে আস্‌তে পার্‌বে। না আবার গৃহস্থের পরিবারদের মত উচু হ'তে ছুটবে। তোমার মত মেয়ে আমার এখন দরকার হয়েছে।

হারানী ইঙ্গিত বুঝিল। হাসিয়া বলিল,—জোগাড় ক'রে দেব। বলিয়া চলিয়া গেল।

হারানী হাওয়ার মত চলিয়া গেল। অবিনাশবাবু বাঙ্গালার নারী-সমস্যার কথা ভাবিতে লাগিলেন।

দিনের আলো নিবিয়া আসিল বলিয়া। গোধূলির ম্লান আকাশ অন্ধকারের প্রতীক্ষায় তাহার শেষ প্রদীপ-শিখাটি উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়া আছে। শুভ্র রক্তিম আভায় সুন্দর মনোরম! পল্লীর আকাশ নির্মেঘ, দিগন্ত এত সুন্দর—কমলা কোন দিন দেখে নাই। এই যেন তাহার প্রথম, এই যেন তাহার শেষ। সে অতৃপ্ত নয়নে সেদিকে চাহিয়া রহিল। পায়ের কাছে তাহার পুরস্কার সকল পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার হাতে কাটা সূক্ষ্ম সূতার রাশি, তাহার নিজের হাতে বোনা নানান রকমের সূক্ষ্ম সুন্দর কারুকার্য্য সকল, প্রদর্শনীতে সদ্যপ্রাপ্ত চরকা, রৌপ্য ও স্বর্ণপদক, বিশুর দেওয়া একখানি রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা—এমনি আরো কত কি তাহার পার্শ্বে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সারাদিন সুখ্যাতির ভারে, লোকের সস্নেহ দৃষ্টিতে, নানান প্রশ্নের উত্তরে সে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। তাহার বিশুদা তাহাকে উপহার দিয়াছে। কতজন কত মেডেল, কত দিন দিল, তাহাতে তাহার আনন্দ আসে নাই। প্রিয়তমের নিকট হইতে এই প্রথম উপহার গ্রহণে তাহাকে একটা অভিনব তৃপ্তি দিল!

একবার সে চয়নিকাখানি তুলিয়া লইল। আবার রাখিয়া দিল। আবার ভাবিতে বসিল। আজ যেন তাহার চিন্তার আর সীমা নাই। সে যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে ভাবিল,—এত যশ, এত নাম, এত মান রাখিবার মত তাহার এতটুকু স্থান নাই! তবে কেন তাহারা আমায় দিল—এত ঐশ্বর্য্য, এত সম্পদ, ভালবাসার এত তীব্র যাতনা! ভিখারিণীকে রাজরাণী সাজাইয়া সকলে পাগল করিল কেন? সত্যই কি তাহার যশের জন্য তাহাদের এই স্নেহের উপহার, পুরস্কার! না ইহার মধ্যে তাহাদেরই কৃতিত্ব, তাহাদেরই গুপ্ত যশ রহিয়াছে, তাহাদেরই

নেতৃত্বের প্রচ্ছন্ন গৌরব রহিয়াছে। কৈ আমার যশ যদি সত্যই থাকিত, তাহা হইলে এত বড় বাঙ্গালা দেশে আমার মত ক্ষুদ্র দরিদ্র রমণীর এত-টুকু স্থান কি হয় না? তবে নিশ্চয়ই এ যশের মূল্য, এ গৌরবের সুফল তাহারাই উপভোগ করিবে, যাহারা তরুণ-তরুণীদের জীবন লইয়া এমনি করিয়া ছিনিমিনি খেলে—খেলিবে—খেলিতেছে। তাহার মনে হইল বলে, কেউ যেন তাহার মত প্রবঞ্চিত না হয়! ইচ্ছা হইল, চীৎকার করিয়া বলে, যাহারা তোমাদের জীবন লইয়া অপব্যয় করে, তাহারা তোমার শত্রু। দেশবাসীকে ভালবাসিব কেন! কেউ ত আমায় ভালবাসে না! আমি তার কেউ ত নই! তবে! আমার কি কেবল ত্যাগেরই অধিকার, ভোগের এতটুকু দাবী নাই! এমনই চিন্তা করিতে করিতে সে দূরে পল্লীগৃহস্থের বাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল।

কমলাকে তদবস্থায় দেখিয়া হারানী বলিল,—একি কমলা! এখনও তুমি গা ধুতে যাও নি? এসবগুলো তুলে নিয়ে তার পর ব'সে ব'সে ভাবতে পার না?

কমলা তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল,—ভাবনা কি আর হাত-ধরা?

হারানী বলিল,—তা নয় নাই হ'ল—এখন যাও ত, আগে গা ধুয়ে এসো, আমি ভাবলাম, এতক্ষণ বোধ হয় তোমার সব সারা হ'য়ে গেছে। আমারই দেরী হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে তাড়াতাড়ি ক'রে অবিনাশ-বাবুর ঘরটা ঠিক ক'রে জল তুলে দিয়ে এলাম। যাও—যাও—আগে গা ধুয়ে এস! সারাদিনের সামিজটা প'রে কি ক'রে আছ?—সঙ্গে যাব? সন্ধ্যেটা হ'য়ে গেছে?

কমলা বলিল.—আজ নয় তুমি আছ, কালকে আমার জন্যে এমন ক'রে কে বল্‌বে দিদি, একলাই ত আমায় যেতে হবে?—এই বলিয়া গামছা আর ঘড়াটা লইয়া কমলা বাহির হইয়া গেল। হারানী সেই রাশী

কৃত অ-গোছান যশমানের স্তূপ ঘরে গুছাইয়া তুলিতে লাগিল।

এক ঘন্টা কাটিয়া গেল। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার আকাশ হইতে নামিয়া আসিল। জল-স্থল-শূন্য ছাইয়া ফেলিল। তবুও কমলা ফিরিল না। হারানী রান্না চড়াইয়া দিল। আরো কিছুক্ষণ গেল। বোধ হয়, আবার সে ঘাটে বসিয়া ভাবিতেছে,—এই আসিল বলিয়া। কিন্তু আর ত চুপ করিয়া থাকা যায় না। হারানী কুটীরের বেড়ার ধারে আসিয়া হাঁক দিল,—কমলা—কমলা আর দেরী ক'র না।

কিন্তু কমলা কোথায়! কে উত্তর দিবে?

উত্তর না পাইয়া হারানী চমকিয়া উঠিল। নিমেষে ভয়ে চিন্তায় তাহার মন উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাহার বুক 'গুরু 'গুরু করিয়া উঠিল। কেহ নিকটে থাকিলে দেখিত, তাহার মুখে একটুও রক্ত নাই।

শূন্য জনমানবহীন খালের ধারে কেবল বিরাট অন্ধকার! খালের জলের কেবল ছল ছল শব্দ! আর আকাশে বাতাসে কমলা নামের প্রতিধ্বনি! হারানী ঘাটের কাছে আসিয়া দেখিল, শূন্য ঘড়াটা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারই কিছু দূরে আধ-ভেজা লাল গামছাটা ধূলার পড়িয়া রহিয়াছে। সে কাঁদিতে কাঁদিতে সাধু বিশুকে সংবাদ দিতে ছুটিল।

আজকার সভা শেষ হইয়া গেল। সাধু আর বিশু যে দলে ছিল, তাহাদের হার হইল। তাহারা সমিতির কার্য্যকরী কমিটির সভ্য হইতে পারিল না। তাহারা কর্ম্মী, সত্যই সংকর্ম্মী; কিন্তু তথাপি, তাহারা যে পল্লীর মঙ্গল করিবে, এ বিশ্বাস সে দিন কেহ যেন করিল না। আজ তাহাদের বিপক্ষে হাত উঠিল বেশী। নীরেনের দলের জয় হল।

নৈরাশ্য-ক্ষুব্ধ মনে বিশু এই কথাটাই ভাবিল,—যাহারা দেশের গ্রামের মঙ্গল করিতে ব্রতী হয়, তাহারা এত বিশ্বাসঘাতক হয় কিরূপে? বিশু

ভাবিয়াছিল, তাহারা যখন সত্যের দিকে, তখন তাহাদের জয় হইল না কেন ? তবে সত্যকে কি জয় করিতে হইবে দলাদলি করিয়া ! তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সাধু তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিল,—আর ভেবে লাভ নেই। এ বছর যা হবার হ'য়ে গেছে। আর বছরে তার চেষ্টা করা যাবে।

—আবার আসছে বছর,—কেন সাধু, কিসের জন্যে ! সম্পাদকের পদের জন্যে ? সহকারী সম্পাদকের পদের জন্যে ? আমরা ত' তা চাইনি, আমাদের গ্রামের দুর্দ্দশা দেখে আমরা তার মঙ্গলের জন্যে—কল্যাণের জন্যে—সেবা-সমিতি তৈয়ারি করেছিলাম। পদ যাদের দরকার, তারা তৈয়ারি করেছিল। আমি পল্লীবাসীদের শুভ-কামনা করেছিলাম নিজের সামর্থ্য দিয়ে, তা সফল করবার চেষ্টা করেছি এই মাত্র।

সাধু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল,—কিন্তু সমিতির সঙ্গে, দেশের বা গ্রামের মঙ্গলের সঙ্গে, আর ও-পদের সঙ্গে যে-একটা গূঢ় সম্বন্ধ আছে, তা'ত বুঝতে পার ? অন্ততঃ আজকে ত পারলে ?

বিশু উত্তরে বলিল,—আজ অনেক কিছু বুঝতে পারছি ! পারছি এতদিন যা কাজ করেছি, তা' তথাকথিত নেতাদের জন্যে করেছি, দেশের জন্যে নয়। দেশের জন্যে করলে, গ্রামের লোক আমার কথায় বিশ্বাস করত, কান দিত। যাদের জন্য করেছি, তাদের কথায় তারা কান দিয়েছে। আমাদের সামর্থ্য দিয়ে তাদেরই অর্থ আর যশ জুগিয়ে এসেছি এতদিন ! সেই বিজ্ঞাপনের বলেই আজ তারা জয় করলে।

এমন সময় চরণ তথায় ছুটিয়া আসিল ! গায়ে তাহার এখনও জ্বর রহিয়াছে, সে অত্যন্ত দুর্ব্বল। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—সন্ধ্যার পর থেকে কমলা-দি'কে হারানী খুঁজে পাচ্ছে না। সে খালের ঘাটে গা ধুতে গিয়ে আর ফেরে নি !

বিশু তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল,—খুঁজে পাচ্ছে না? ফেরেনি? তারপর?

চরণ ক্ষীণস্বরে বলিল,—তোমাদের সেথা শিগ্‌গীর ক'রে যেতে ব'লে দিলে হারানী!

বিশু একবার সাধুর মুখের দিকে চাহিল। তারপর আর কোন কথা না বলিয়া দুইজনই কমলার কুটীরের দিকে চলিল। যাইবার সময় চরণকে বলিল,—তুমি শোও গে, আবার অসুখ করবে, আমরা খুঁজে তারপর তোমায় সংবাদ দেব। আমাদের জন্যে রাত জাগ্‌তে হ'বে না। আমাদের ফিরতে রাত হ'বে, ঠাকুর-মাকে ব'লে দিও।

নিমেষে তাহারা কমলার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। কেবল হারানী কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত বসিয়া আছে। নয়নে তাহার অশ্রুধারা। তাহাদের দেখিয়া সে জোরে কাঁদিয়া উঠিল। তারপর শান্তকণ্ঠে তাহাদের নিকট সংক্ষেপে যতটা পারিল, ঘটনাটি সব ব্যক্ত করিল।

সাধু সকল কথা শুনিয়া বলিল,—ঘাটে কলসী আর গামছা পড়েছিলো?

—হাঁ, শূন্য কলসী আর গামছা এখনো প'ড়ে আছে।

—আচ্ছা ঘাটের ওপারে যে পান্‌সীখানা ছিলো, তার মাঝিদের জিজ্ঞাসা করেছিলে?

—অন্ধকারে কাউকে দেখা যায়নি ত, পান্‌সী আবার কোথা?—বলিয়া হারানী কাঁদিয়া ফেলিল।

সারারাত জলস্থল তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল। কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না। গ্রামের অধিকাংশ লোক মন্তব্য করিল, নিশ্চয়ই সে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। বিশুর সেজ-বৌদিদি বলিল,—ওর জন্যে অত

খোঁজাখুঁজি কেন ? মরেছে ভালই হয়েছে। আপদ গেছে। যে বেহায়া মেয়ে, গ্রামটাকে লজ্জা-সরমের মাথা খাইয়েছিলো।

অবিনাশবাবু হারানীর নিকট হইতে সব শুনিয়া বলিলেন,—শেষে ঐ পথই সে নিলে ? কিন্তু আমার মনে হয়, সে ত ডোববার মেয়ে নয় ! আর ডোববার ত কোন কারণই আমি ভেবে পেলাম না। কিন্তু তোমার কথা শুনে ও-ছাড়া ত আর কিছুই ভাবাও যায় না। হারে সরলা, তোরা কি এমনি ক'রে কেবল আত্মহত্যা ক'রেই মরবি ? নিজেদের পথের দাবী নিজেরা করবি না কোনদিন ? সেদিন তাকে দেখে আমার তৃপ্তি হয়েছিল, মনে করেছিলাম, এমন মেয়ে যদি অনেক পাই, তবে আমি—বলিয়া কি যেন ভাবিলেন।

হারানী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কোন বাক্য তাহার স্ফুরণ হইল না। অবিনাশবাবু দূরে পথের দিকে চাহিয়া কি যেন আবার ভাবিতে লাগিলেন।

রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া গেল। গ্রামের প্রায় সকলেই এ-বার্ত্তা শুনিল। দুঃখ যে কেহ করিল না এমন নহে ; গ্রামের একটা প্রিয় কুকুর মরিলে যে শোক হয়, এ যেন তেমনই।

বিশু-সাধু কমলার কুটীরে আসিল। হারানী তাহাদের আনিয়া কমলার কক্ষে বসাইল। বিশু ঘরের চারিদিক লক্ষ্য করিল। কমলার প্রাপ্ত সকল উপহার—সকল পুরস্কার সে তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিল। সাধু কোন কথা না বলিয়া বন্ধুর ব্যথা নিজের ব্যথাভরা প্রাণে অনুভব করিতে লাগিল।

এমন সময় বিশু ম্লান হাসিয়া বলিল,—দেখ সাধু, তাকে এই চয়নিকাখানা কেন দিয়েছিলাম্ জান ?

সাধু অতি ধীরে বলিল,—কেন ?

—আমি যখন ছ'মাস এখানে ছিলাম না, তখন সেখানে একজন বন্ধু আমায় ব'সে ব'সে পড়াত,—তার সুর ছিল যেমন, বলার ভঙ্গিমাও ছিল তেমনি অপূর্ব্ব! সে এ থেকে পদ্যগুলো বল্‌তো, আমার ভারি মিষ্টি লাগ্‌তো; মনে হ'তো, কে যেন ভালবাসার কথা কইচে। সেই থেকে এ বইখানা আমার ভাল লাগ্‌তো। তাই তাকে আমি দিয়েছিলাম। আগে দিলে দু'দিন পড়তে পে'ত।

সাধু শুধু বলিল,—তা' পে'ত।

—এই কাপড়টা বোনার জন্যে সে মেডেল পেয়েছিল। তোমার দেওয়া মেডেলটা প'ড়ে রয়েছে দেখ।

সাধু বিমর্ষবদনে একবার বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিল,—দেখেছি!

বিশু বলিল,—আচ্ছা, আজ যদি তার এখানে মা-বোন-ভায়েরা থাক্‌ত, এখন কান্নার হাট ব'সে যে'ত না?

সাধু রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করিল,—তা যে'ত।

—কিন্তু কেউ নেই, কে আর কাঁদবে? এমনই কেউ কাঁদবে না, মরা ভারি ভাল।—তোমারও আগ্‌লে বেড়ান কাজটা ক'মে গেল—আমিও নিশ্চিন্ত হ'লাম।

হারানী এতক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল, আর দাঁড়াইতে পারিল না—চলিয়া গেল। সাধু জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া কি দেখিতে লাগিল।

বিকাল বেলা। হারানী, চরণ, সাধু ও বিশু বসিয়া আছে। দারোগা সাহেব কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কমলার সম্বন্ধে সকল সংবাদ লইয়া গিয়াছে। ডুবিয়া মরিয়াছে, তাহারই একটা রিপোর্ট প্রস্তুত হইতেছে। বিন্দুবাসিনী ঠাকুরের পূজারী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সাধুকে আর বিশুকে তিনি ডাকিলেন, তাহারা নিকটে যাইবামাত্র তিনি গোপনে বলিলেন,—

দেখ সাধু, তোমরা হয় তো মনে করচো, কমলা মেয়েটা ডুবে ম'রেছে, কিন্তু আমার মনে হয়, তা না।

বিশু আশায়-আশঙ্কায় তাহার শেষের কথাগুলি শুনিবার জন্ম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তিনি বলিলেন,—আমি আজ বিন্দুবাসিনীর সেবা করতে গিয়ে কা'র যেন কান্না শুনতে পাই। মেয়েমানুষের গলা। আমি হরিসিংকে জিজ্ঞাসা করলাম। তা'তে সে যা বল্লে, তা'তে ত আমার কমলাকেই মনে হ'লো। কাল্‌কে ত তাকে প্রদর্শনীতে সেই কাপড় সেই জামা প'রে যেতেই দেখেছি।

সাধু হারানীকে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—কাল কমলা যখন গা' ধুতে যায়, তখন তার সেই বাসন্তী রংয়ের লাল বুটীদার কাপড় প'রে না ছিল?

হারানী আগ্রহে বলিল,—হাঁ, কেন তা'কে পাওয়া গেছে?

—না, জিজ্ঞাসা করচি।

বিশু বলিল,—হরিসিংয়ের মেয়েকে আমি কলেরা থেকে বাঁচিয়েছি। সে আমাকে ভুলবে না। আমি যাই দেখি,—বলিতে বলিতে উত্তেজনার আতিশয্যে সে উঠিয়া পড়িল।

সাধু তাহাকে ধরিল। বলিল,—এত উতলা হ'লে চল্‌বে না। এ যদি সত্য হয় ত বুঝ্‌তে পারচো, কার হাতে গিয়ে সে পড়েছে। যার দ্বারা অনেক কিছু হ'তে পারে, তোমার মত একটা ছেলে কি করবে? এমন হঠাৎ গেলে তোমার আর ফিরে পাওয়া যাবে না। সেখানে একটা সিং নেই।

পূজারী বলিলেন,—মেজবাবুকে ত জানা আছে সকলের। তবে আজ তিনি পার্শ্বের গ্রামে গেছেন, একটা জমির বন্দোবস্ত করতে।

বন্ধুর স্মৃতি

বিশু রাগিয়া অন্তরে অন্তরে ফুলিতেছিল। কি করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। পূজারী ও সাধুতে আলাদা কি সব পরামর্শ হইল। বিশু চুপ করিয়া শুনিল। কোন কথাটি বলিল না। কোন প্রতিবাদ করিল না। গুম্ হইয়া সে বসিয়া রহিল।

পূজারী চলিয়া গেলে সাধু বিশুকে বলিল,—বিশু, আজ সত্যই বল্‌চি তোমায় দেখে আমার ভয়ও যেমন হচ্ছে, ভাবনাও তেমন হচ্ছে। পূজারীর কথা যদি সত্য হয়, তবে একদিকে যেমন ভাল হ'বে, অন্যদিকে তেমন মন্দ হবারও সম্ভাবনা আছে। আমি জানি মুখুয্যেদের মেজবাবু সব পারেন। প্রদর্শনীতে তাঁর ব্যবহার দেখে সত্যই আমি ব্যথিত হয়েছিলাম।

বিশু তখনও কোন কথার উত্তর দিল না। সে মনে মনে নিশ্চয়ই কিছু-একটা ফন্দি আঁটিতেছিল। তাহার ব্যবহারে সাধু বুঝিল ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ।

সাধু এইবার গম্ভীর হইয়া বলিল,—বিশু, আজ তোমায় একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

এ প্রশ্ন এত নূতন তাহার কাছে যে, সে কিছুক্ষণের জন্য অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। জীবনে সে স্ব-ইচ্ছায় কখন মিথ্যা বলে না, বলিতেও পারে না, একথা সাধুর চেয়ে এ গ্রামে কেহ বেশী জানে না। তথাপি সে কেমন করিয়া তাহার নিকট হইতে এমন প্রতিজ্ঞা করাইতে চায়! অন্য কোন দিন বা অন্য কোন সময়ে একথা হইলে বোধ হয় তাহাদের কতদিন পরস্পর মুখ দেখাদেখি হইত না। রাগে বোধ হয় রক্তারক্তি কাণ্ড হইয়া যাইত। কিন্তু আজ হইল না। বিশু একটু হাসিয়া বলিল,—কি প্রতিজ্ঞা করতে হ'বে বল, আমি তাই করবো। সত্য বলচি!

সাধু বলিল,—বল, আজ রাত্রিতে তুমি কোথাও যাবে না? আমায় সব বন্দোবস্ত করতে দাও। তারপর কাল সকালে আমি সব ঠিক ক'রে দেব। ঠিক বল্‌চো?

বিশু ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল,—ঠিক।

সাধু বলিল,—আজ রাত্রে তোমার বাড়ীর চৌকাট পার হবে না?

বিশু বলিল,—না।

—আচ্ছা, শুনে সুখী হ'লাম। আমি এখন একবার দারেগাবাবুর বাড়ী থেকে আসি—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সাধু যাইবার সময় চরণকে দেখিয়া গেল এবং বিশুর সম্বন্ধে তাহাকে সতর্ক করিয়া গেল। অতি বিশ্বাস তাহার আজ কোথা গেল! চরণকে সকল ঘটনা সাধু বলিল এবং তাহাকে সে আশ্বাস দিয়া গেল যে, যদি বিন্দুবাসিনীর ঠাকুরবাড়ীতে সে থাকে বা তাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কাল রাত্রি ভোর না-হইতেই মুখুয্যেদের মেজবাবু কি শাস্তি পায় দেখা যাইবে।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইতে চলিল। এক কক্ষে নতি ও ঠাকুর-মা অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। অপর কক্ষে বিশু আর চরণ নিদ্রা যাইতেছে। চরণ উঠিয়া দেখিল, বিশু ঘুমাইতেছে। কিন্তু বিশু ঘুমায় নাই, চরণদা উঠিতেই সে নিদ্রার ভাণ করিয়াছে। এমন কতবার চরণ উঠিয়াছে, আবার রোগক্লিষ্ট দেহখানা লইয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

বিশু জাগিয়া সকল বিষয়ই লক্ষ্য করিতেছিল। সে বুঝিয়াছিল, তাহার চরণদা আর কতক্ষণ জাগিয়া থাকিবে? হইলও তাহাই। চরণ ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার চিরপ্রসিদ্ধ নাসিকা-গর্জ্জন সে শুনিতে পাইল। সে তাহার বিছানা ছাড়িয়া উঠিল এবং হাতে একগাছা লাঠি লইয়া সেই অন্ধকারের পথে যাত্রা করিল।

তখন সকলে ঘুমাইতেছে। কোথাও একটি জনপ্রাণী জাগিয়া নাই।

বিশু লাঠি হাতে করিয়া বাহির হইয়া যাইবার পর বহুক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। তখন রাত্রি কত হইবে কে জানে! চন্দ্রশূন্য আকাশ ও অন্ধকার পৃথিবী রাত্রির বয়স নির্ণয় করিতে দিল না। এমন সময় কমলার পরিত্যক্ত কুটীরে কে আসিয়া ডাকিল,—দিদি! দিদি! শিগ্‌গীর দরজা খুলে দাও! আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

প্রথম ডাকেই হারানীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে সাহসী। জীবনে সে বহু সাহসের কার্য্য করিয়াছে। সে কান পাতিয়া শুনিল; স্পষ্ট করিয়া শুনিল এ যেন তাহার পরিচিত কণ্ঠস্বর। এই কণ্ঠস্বরই ত সে শুনিতে চাহিয়াছে—আজ একদিন। ভয় নাই, ভাবনা নাই! দ্বার খুলিয়া দিতেই একটা আর্ত্ত—ক্লান্ত কপোতী তাহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বিস্ময়ে—আহ্লাদে হারানী কিছুই বলিতে পারিল না; কেবল বলিল—কমলা? কোথা ছিলে?

কমলা তাহার কাঁধে মুখ লুকাইয়া তখন কাঁদিয়া ফেলিল। হারানী তাহাকে কক্ষে লইয়া গেল। তক্তাপোষের উপর বসাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। অথচ, কেন যে দিতে লাগিল, তাহা সে জানে না।

কিছুক্ষণ পরে কমলা বলিল,—দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় নিয়ে অন্য জায়গায় চলো। আমি আর এখানে থাক্‌বো না।

—এখানে তোমার ভয় করে? কোথায় ছিলে?—

—দিদি, ভয় করে, আমার জন্যে নয়!

—তবে?

—বিশুদা'র জন্যে! আজ আমি বেশ বুঝেছি, তিনি আমায় বড় ভালবাসেন!

—আজ !

—আজ ! তাঁর দয়ার—ভালবাসায় আমি ঠাকুরবাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি। না হ'লে দিদি !—বল, আমায় তুমি অন্য জায়গার নিয়ে যাবে! এ গ্রামে থাক্‌বো না—এ কালা মুখ নিয়ে থাক্‌বো না। কাল সকাল হ'লে এ বাড়ীতে সারা গ্রাম ভেঙ্গে পড়বে, আমি মুখ দেখাতে পারবো না। চল, এখুনি চল—দেরী করলে হবে না। আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না, বিশুদা'কে রক্ষা কর। আমার সব গেছে, আমার জন্যে ভাবনা নেই। সামান্য আমার জন্যে তাঁ'কে হারালে—গ্রামের বিরাট ক্ষতি।

হারানী অবাক্ হইয়া তাহার আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাহার কর্দ্দমাক্ত কলেবর, কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হস্তপদ, চোর কাঁটাতে ভরা বসনের শেষপ্রান্ত—সকলই সে লক্ষ্য করিল। বলিল,—এখুনি কোথা যাবে ?

কমলা পরম আর্ত্তকণ্ঠে বলিল,—এখুনি না হ'লে হবে না। দিদি, সকাল হ'লে সব মুস্কিল হ'বে। তোমরা আমায় যেতে দেবে না, তোমরা আমায় রাখ্‌তেও পারবে না। যে আমায় ভালবাসে, যাকে আমি ভাল্‌বাসি, তার জীবনের আমি কলঙ্ক হ'য়ে থাক্‌বো আজীবন ? এ গ্রামে একটা লোকেরও সে ভক্তি পাবে না, শ্রদ্ধা পাবে না আমার জন্যে।

হারানী ভাবিতে লাগিল।

কমলা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল,—দিদি, যিনি আমার জন্যে এমন বিপদের মুখে নিজেকে ফেলতে পারেন, তাঁর কতটা আমি আত্মসাৎ করেছি—তাই ভাবচি! তিনি বরাবরই বল্‌তেন, এ গ্রামকে সকল দিক থেকেই উদ্ধার করা আমার ধর্ম্ম,—সে পথে আমিই তাঁর আজ সহায় না হয়ে, বাধা হ'য়ে থাকবো ! আমি থাকলে এখানে সে গ্রামকে ভালবাসতে পারবে না তেমন ক'রে- তার সমস্ত প্রাণটা ঢেলে দেবে আমারই সেবায়, তা আমি পারবো না। দিদি, আর দেরী নয়, এই অন্ধকারেই বেরিয়ে প'ড়ি চল।

হারানী ভাবিয়া বলিল,—তুমি কোথা ছিলে কাল ?

কমলা বলিল,—সে কথা পরেও ত হ'তে পারে। যেতে যেতে হবে'খন লক্ষ্মীটি, বেরিয়ে পড়। আর এখানে একটুও থাকতে আমার ভয় ক'চ্ছে। সত্যি বলচি, তা শুনে তুমিও নিশ্চয়ই আমায় যেতে বলবে। যদি একথা সত্য না হয় ত, পথের মধ্যে তুমি ফিরে চ'লে এসো—তুমি খালি ভেবে দেখ, কোন্ মুখে আমি কাল সকালের আলোতে শত সহস্র গ্রামবাসীর কৌতুহল দৃষ্টির সাম্‌নে দাঁড়াব ? যখন তারা তোমারই মত প্রশ্ন করবে,—কোথায় ছিলে ? কে উদ্ধার করলে ? কেই বা তোমায় চুরি করেছিল ? তখন কি উত্তর দেব ! সত্য, এত বড় গ্রামেও আমার এতটুকু স্থান হ'বে না—মিথ্যা ব'লেও রেহাই নেই—হারানী, আমি যে অবিবাহিতা—আমি যে জন্ম-অপরাধী।

আর তাহার কণ্ঠস্বর বাহির হইল না। অশ্রুমগ্ন কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

হারানী ধীরে ধীরে বলিল,—চল !

কমলা বলিয়া উঠিল,—সত্যি-ই !

—সত্যিই।

কমলা আবেগে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। সে যেন স্বর্গ পাইল। তৎক্ষণাৎ সে তাহার সেই পরিহিত বস্ত্রখানি ছাড়িল। হাত-পা-মুখ যত দ্রুত পারিল, পরিষ্কার করিয়া লইল। হারানী তাহার আগ্রহ দেখিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

হারানী বলিল,—কি খুঁজ্‌চ!

কমলা বলিল,—সেই বইখানা ! চয়নিকাখানা।

হারানী যেখানে গুছাইয়া রাখিয়াছিল, সেই তাক হইতে পাড়িয়া তাহার হাতে দিল।

কমলা পরম যত্নে তাহার আঁচলের শেষ প্রান্ত দিয়া তাহা মুছিয়া

লইয়া বলিল,—বন্ধুর শেষ স্মৃতিটুকু নিয়ে যাই দিদি!—দিদি, মেডেল ক'খানাও নাও সঙ্গে!—

হারানী সপ্রশ্নমুখে তাহার দিকে চাহিল।

কমলা বলিল,—অসময়ে টাকার অভাবে ওগুলো বিক্রি করলেও ত কিছু হবে।

হারানী ম্লান হাসি হাসিল। বলিল,—আচ্ছা নিচ্ছি চল।

তারপর দুইজন নারী অন্ধকার গ্রামের পথে বাহির হইল। কমলা আসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই এ ব্যাপার ঘটিয়া গেল। বিপর্য্যয় এমন করিয়াই আসে! যাইবার সময় ভীত করুণ নয়নে কমলা একবার কুটীরখানির দিকে তাহার শেষ দৃষ্টিক্ষেপ করিল। অন্তরে তাহার কি হইতে লাগিল, তাহা অন্তর্য্যামীই জানিলেন।

যাইবার সময় সে হারানীর নিকট বলিতে লাগিল,—তাহার গা ধুইবার সময় কেমন করিয়া দুইজন মাঝি তাহাকে অজ্ঞান করিয়া পান্সীতে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। তাহাকে বিন্দুবাসিনী দেবীর অতিথি-আশ্রমে বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। মুখুয্যেদের মেজবাবু—যিনি তাহাকে সেদিন মেডেল পুরস্কার দিয়াছিলেন, তিনিই তাহাকে অবিচার-অন্যায়ের পথে প্রলুব্ধ করিবার সকল কৌশলই অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তার পর আজ রাত্রিতে অসীম সাহসে বিশু ঠাকুরবাড়ীর সুদীর্ঘ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া হরিসিংহের সাহায্যে তাহাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সে সব বলিয়া যাইতে লাগিল। হারানী শুনিতে শুনিতে অন্ধকার পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

হারানী নিতিনদের বাড়ীর দ্বারের কাছে আসিয়া ডাকিল,—অবিনাশবাবু, দরজাটা খুলবেন! অবিনাশবাবু!

ভিতর হইতে উত্তর আসিল—কে?

—আমি সরলা।

কমলা আকুল বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে তাকাইল! হারানী তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই—যে ভালবাসার জন্যে আজ তুমি এ-গ্রাম ছেড়ে যাচ্ছ—ঠিক তেমন ভালবাসার জন্যেই একদিন এই সরলা এ-গ্রামের গৃহস্থের বাড়ীর চাকরাণী হারানী হ'য়েছিল।

কমলা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। ভাবিল,—কোথায় সে যাইতেছে!

অবিনাশবাবু দরজা খুলিয়া দিলেন। তাহারা দুইজনে ভিতরে প্রবেশ করিল। হারানী তাঁহার বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টি লক্ষ্য করিল। বলিল,—আজ চারটার ট্রেণেই ত রওনা হচ্চেন!—তার জন্যেই বুঝি জেগে গুছা-ছিলেন?

—হাঁ; গুছান হ'য়ে গেছে, বেরুব বেরুব করছিলাম।

—কে, কমলা না?

হাঁ, কমলা। আমরা দু'জনই আপনার সঙ্গে যাব! এ গ্রামে আমাদের বাস উঠেচে! সঙ্গে নেবেন? আপাততঃ এখন?

—এখুনিই?

হারানী দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িল।

—দু'জনেই যাবে? তুমি নয় যেতে পার—কিন্তু কমলা?—

—আমি যে কারণে যেতে পারি, ওকেও ঠিক সেই কারণেই যেতে হ'বে। চলুন, পরে সব বল্‌বো।

—সরলা, আজ আর-একদিনকার কথা মনে পড়্‌চে! আমি ভেবে-ছিলাম—এসব মেয়েদের এ-গ্রামে স্থান হ'বে না; এ স্থান যে পুণ্যবতী-দের জন্য! চল—আমি তোমার কথায় বুঝেছি!

একটা ছোট লাল ব্যাগ একটা বড় চামড়ার ব্যাগে পুরিয়া লইয়া অবিনাশবাবু বলিলেন,—চাবিটা!

—থাক্‌গে চাবি, সঙ্গে নিয়েই চলুন।

—চল—চল। আর সময় নেই ভাববার।

তিনি বাহির হইয়া গেলেন। মুখে একবার উচ্চারণ করিলেন,—

তোমার পতাকা যাহারে দিয়েছ—
তাহারে বহিবার দাও শকতি!

রাত্রি প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে, হঠাৎ চরণের নিদ্রা ভগ্ন হইয়া গেল। সে একবার তক্তাপোষের দিকে চাহিয়া দেখিল, শয্যা শূন্য। বাহিরে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। ঠাকুর-মার ঘরে দেখিল, নাতি আর ঠাকুর-মা নিশ্চিন্তে নিদ্রায় মগ্ন। চরণ কি করিবে ঠিক করিতে না-পারিয়া একবার অস্ফুটে ঠাকু-মা বলিয়া ডাকিয়া ফেলিল।

ঠাকুর মা জাগিয়া বলিলেন,—কে চরণ? ওখানে দাঁড়িয়ে?

—দাদা—না—দাদাবাবুকে খুঁজছিলাম।

—খুঁজছিলাম কিরে? সে কোথা? না, সে গ্রাম গ্রাম ক'রেই গেল! হঠাৎ তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং দেবতার কাছে প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—আমার নাতি, আমার পুত্র, গ্রাম গ্রাম করে, তাই দুঃখ পায়; কিন্তু আমি ত গ্রামও চাই নি, দেশও চাই নি, আমি চেয়েছি ছেলে নাতি নিয়ে সংসার করতে, আমার কেন এত দুঃখ ঠাকুর?

চরণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তারপর সাধুর কথা স্মরণে আসিতেই সে নিদারুণ অমঙ্গল-আশঙ্কায় অধীর হইয়া ঠাকুরবাড়ীর দিকে ছুটিল। জ্বর-তপ্ত অবসন্ন দেহখানি লইয়া তাহার সাধ্যমত পা দুইখানি টানিয়া চলিতে লাগিল। পথ অন্ধকার, অথচ দেরী করিবার উপায় নাই। অতএব তাহাকে একপ্রকার দৌড়িতেই হইল।

ভোরের আলো অস্পষ্ট। চরণ দেখিতে পাইল, কাহারা যেন কাহাকে

সেবা-সমিতির হাত-খাটে করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহারাও দূর হইতে চরণকে দেখিতে পাইল। একজন তাহাকে ডাকিল। চরণ তাহার ক্লান্ত দেহখানা লইয়া তাহাদের দিকে আসিল। আসিয়া হাত-খাটের উপর শায়িত ব্যক্তিটিকে দেখিয়া সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মুখে করুণতম স্বরে কেবলমাত্র একটি শব্দবাহির হইল—বি—শু।

আর্ত্তনাদ আকাশ পাতাল ভেদ করিয়া মুহূর্ত্তে নীরব হইয়া গেল। ক্যাম্প-খাটে বিশুর রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া চরণ এ আর্ত্তনাদ করিল এবং তৎসঙ্গে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সাধু নিজের নয়ন মুছিবার সময় পাইল না। চরণকে ধরিয়া বসিল।

পল্লী-সেবা-সমিতির একটি কক্ষে আসিয়া বিশুর অচৈতন্য দেহখানি রাখা হইল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। দারোগা সাহেব সমস্ত ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। সেবা-সমিতির ডাক্তার আসিয়া বিশুর সেবা করিতে লাগিল।

দশটা বাজিল তখনও বিশুর চৈতন্য হইল না। সেস্থান হইতে চরণকে সরাইয়া দেওয়া হইল।

অনেক চেষ্টা ও শুশ্রূষার পর প্রায় এগারটার সময় বিশুর চৈতন্য হইল। সে একবার চাহিয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিল। সাধু তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বিশু তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—কমলা!

সাধু উত্তর দিল না, কেবল তাহার আরো নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ এমনি কাটিল। বিশুর সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল। ঔষধ ও পথ্য পান করিল। একটু সুস্থ বোধ করিল। বৈকাল বেলা সে সাধুকে ডাকিয়া বলিল,—কমলাকে আমি রক্ষা করতে পেরেছি ত? চরণ-দা আর ঠাকু-মা আমার এই দশার সংবাদ যেন না-পায়। ডাক্তার কি-যেন বল্লে, শির নাকি ছিঁড়ে গেছে।

সাধু ধীরে ধীরে বলিল,—তুমি একটু সুস্থ হও! তারপর সব কথা হ'বে!

বিশু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল,—বন্ধু, আমার আর সুস্থ হ'বার উপায়

নেই। বুকের হাড় ক'খানা কি আছে ?—বলিয়া ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা বুক-খানাতে হাত দিয়া একবার সামান্য টিপিল।

সাধু পরম যত্নে তাহার হাতখানি সরাইয়া দিয়া বলিল,—ওসব কথা এখন থাক্।

বিশু বিস্ময়ে একবার তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল,—তোমায় ভেবেছিলাম বুদ্ধিমান্, কিন্তু তুমি কি কথা বল্‌চো, আজ যদি না বল্‌তে পাই, কাল আর এ সব কথা কি শুন্‌তে পাবে ?

সাধু আর কোন উত্তর দিল না। মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু বাহিরে তাহার কিছুমাত্র প্রকাশ ছিল না। অল্পক্ষণ নীরবে কাটিল। বিশু পুনরায় বলিল,—সাধু, আমার একটা কথা শোন, কমলাকে অন্য কোথাও নিয়ে রেখে এস খুব তাড়াতাড়ি। এই আমার যাবার দু'একদিনের মধ্যেই, বুঝলে ?

সাধু যথাসম্ভব গম্ভীর হইয়া বলিল,—তুমি চুপ কর একটু !

বিশু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল,—চুপ করছি কিছুক্ষণ বাদে—আগে যতটা পারি বলেনি। নোন্‌তু কোথা ? একবার আমার কাছে ডেকে দাও ত।

নোন্‌তু কাছে আসিল। বিশু একবার হাসিয়া বলিল,—আমার বুকে একটু লাগ্‌চে, আমি বেশী কথা বল্‌তে পারবো না, তুই আমার সামনে কমলার কথা সব শুনিয়ে দে, আজ পর্য্যন্ত বলি বলি ক'রে সাধুকে বলা হয় নি। বল্, আমার সামনে, আমি শুনি। আমার পর কেবল এই কমলাকে রক্ষা করতে পারবে নোন্‌তু ! বল্ একে।

নিরুপায় নোন্‌তু বলিতে লাগিল,—যেবার জহরপুরে ভীষণ অত্যাচার লুণ্ঠন সব হ'তে লাগ্‌লো, তখন যারা সেই সব দুর্ব্বৃত্তদের হাতে সব খুইয়েছিল, তাদের মধ্যে কমলার মাও একজন।

বিশু বাধা দিয়া বলিল,—সব মানে বুঝেচ ? কেবল টাকাকড়ি নয়—মান, সম্ভ্রম—সতীত্বও।

নোন্‌তু বলিল,—তুমি আর কথা ব'ল না, আমি ভাল ক'রেই ব'লে দিচ্ছি। আমরা কয়েকজন সে গ্রামে গেছ্‌লাম, অসহায়—নিঃস্ব—আহত

গ্রামবাসীদের সাহায্য করতে। সহরের বিপদত্রাণ-সমিতি থেকে আমাদের সাহায্যের সকল দ্রব্যাদি দিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল। সেই সকল দ্রব্য নিয়ে যার যা আবশ্যক, সেইমতে যথাসাধ্য সাহায্য ক'রে যাচ্ছি, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড মাঠের ধারে একটা সামান্য বাড়ীতে এসে দেখি, একজন স্ত্রীলোক আহত হ'য়ে শুয়ে আছে, আর তার পাশে আছে একটি মেয়ে—আমাদের কমলা। আমাদেরে দেখে তাদের সেই দুঃখের ভিতরও তৃপ্তি এলো, বিশু তাদের সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলো; আমি তারই কিছুদূরে অন্যান্য আর্ত্ত লোকদের সাহায্য করতে লাগলাম।

সাধু বিশুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল,—বিশু ঘুমিয়ে পড়েছে দেখ্‌ছি! একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তা হ'লে আশা আছে। তুমি বল এবার মন দিয়ে শুনি।

নোনতু বলিল,—তারপর জানতে পারলাম কমলার মা বিধবা ছিল তা'র সমস্ত সম্পদ এবং সতীত্ব লুণ্ঠন ক'রে যখন দুর্ব্বৃত্তেরা চ'লে যায়, তখন তারা সেই অজানা একান্ত নিরুপায় অপরাধের জন্য সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের স্নেহ-দয়ামায়া হ'তে বহুদূরে দণ্ডিত হ'য়ে বসবাস করছিল। এমন সময় আমরা গিয়ে পড়ি। কমলার মা গুরুতর ভাবে আহত হ'য়েছিল, কমলাকে আমাদের হাতে স'পে দিয়ে মারা গেল। কমলাকে বিশু সেই থেকে নিয়ে এলো।

হঠাৎ বিশু বলিল,—কেন আনলাম বলো!

উপস্থিত অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত ও চমকিত হইয়া উঠিল। সে পুনরায় বলিল,—সাধু, তার মা বলেছিলো—তোমরা আমাদেরও সাহায্যের জন্যে এনেছ বস্ত্র, অন্ন; তা'তে আমার কি! আমার মেয়েকে যদি রক্ষা করতে পা'র, তাকে যদি আমার পূর্ব্বেকার সম্মান সম্ভ্রম অধিকার ফিরিয়ে দিতে পার, তবেই তোমাদের সাহায্য সার্থক। তারা আমার এসব লুণ্ঠন ক'রে নিয়েছে, অথচ অপরাধ আমার নেই। আমি সেই সম্মান কমলাকে দেব ব'লে এনেছিলাম; কিন্তু কি হ'লো কই সে ত এলো না, আর লজ্জায় আসবেই বা কি ক'রে! সাধু, তুমি তাকে দেখো! হারানীর আসা উচিত ছিল না?

কেহ কোন উত্তর দিল না। সকলে নীরব রহিল। অনন্তবাবু চরণকে ধরিয়া আনিল। চরণ বিশুর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। চরণ কাঁদিতেছিল, তাহার বিশ্বাস বিশু এতক্ষণ এ সংসারে নাই ; সেইজন্য অনন্তবাবুকে সঙ্গে করিয়া আনিল। পাছে, তাহাকে কেহ আবার তাড়াইয়া দেয়।

বিশু চরণের স্বর শুনিয়া ডাকিল,—চরণদা কাছে এস। আমার বুকে একবার হাত বুলোও, তুমি হাত বুলোলে বুকের জ্বালা একটু জুড়োবে।

চরণ নিকটে আসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বিশুর নেত্রেও কয়েক ফোঁটা অশ্রু চকচক্ করিয়া উঠিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—চরণদা দুঃখ কেন ? আমি চ'লে যাবো, বাবা আবার আসচেন।

অনন্তবাবু নীরবে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার সাধুর দিকে একবার বিশুর দিকে চাহিলেন। বিশু কাতর কণ্ঠে বলিল,—সাধু, আমার চোখ দুটো মুছিয়ে দে ভাই, আমার হাত যে বাঁধা !—ওঃ এমন ক'রে ভেঙ্গে দিলে কেন তারা !—আমি ত তাদের কিছু করিনি ! চরণদা, আমার ফতুয়ার পকেটে বাবার দেওয়া টেলিগ্রাম আছে, দেখো !

ডাক্তারবাবু আসিলেন, নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তারপর বিমর্ষমুখে এক ডোজ ঔষধ সেবন করাইতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বিশু মিনতি করিয়া বলিল,—ডাক্তার বাবু, আর একটা কি দুটো দিন বাঁচান আমাকে যায় না ? তা' হ'লে বাবার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাই। বুকের ভেতরটা কেমন যেন জ্বলে যাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন,—ও কিছু নয়, ও কিছু নয়।

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,—বুঝেছি, তাহ'লে হ'বে না ! সাধু—সাধু—বন্ধু—আমার শেষ স্মৃতিটা রেখ। ওঃ, এদেশে সেবা করতে গেলে,—মুক্তি দিতে গেলে—এদেশের মুক্তিহারাদের লড়তে হ'বে, এদেশের মুক্তিহারাদেরই সঙ্গে। অপর শত্রু নেই। সাধু, মনে রেখ, অপর শত্রু নেই, তোমার পরম আত্মীয়রাই তোমার শত্রু। তা'দের

[illegible] পরম আ[illegible] পেতে নেওয়াই দেশ-সেবা! ওঃ, বুক জ্বলে গেল, হাত দিয়ে একটু বুলিয়ে দাও চরণদা। আঃ! কাকাবাবু, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন—মনে মনে নয়, আমি নিজের কানে শুনে যাই।

বহুদিনের সংযমী পুরুষ, বহু কঠোর দুঃখে অচল অটল অনন্তবাবু রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—আশীর্ব্বাদ কি আর করি!

বিশু ব্যাকুলস্বরে কহিল,—তবু!

অনন্তবাবু কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কহিলেন,—আশীর্ব্বাদ করি, যদি পরজন্ম থাকে ত, তবে পরে তুমি মুক্ত দেশে জন্মগ্রহণ ক'রো। যেখানে অন্যায় বেদনা মানুষকে প্রাণে বইতে হ'বে না, সেই দেশে।

বিশু উপর দিকে চাহিল। বলিল,—চরণদা, একবার কমলাকে আর—

চরণ ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—কমলাদি' নেই, তা'কে পাওয়া যাচ্ছে না—সাধু সজোরে তাহার মুখ টিপিয়া ধরিল। কিন্তু তখন তাহার বলা হইয়া গিয়াছে।

বিশু বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে একবার তাহার দিকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—নেই? তবে?—

তারপর সব নিস্তব্ধ।

তখন সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে। একখানি আপ্ ট্রেণ হীরেনবাবুকে বহন করিয়া সোণারপুর গ্রামে আসিতেছিল। অপর একখানি ডাউন ট্রেণ কমলা, সরলা আর অবিনাশবাবুকে লইয়া উদার নীলিমাকে ধোঁয়ার কালিমা মাখাইতে মাখাইতে সোণারপুর ছাড়িয়া তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল।

—শেষ—